স্বস্তিকা

দাম : পাঁচ টাকা
২৩ মে, ২০১১, ৮ জ্যৈষ্ঠ - ১৪১৮
৬৩ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা

রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে সর্বাধিক ভোটদান গণতন্ত্রেরই জয়

১৯৫২ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের শতাংশ।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

তৃণমূলের ইস্তাহার একটি পুস্তক মাত্র ❑ অমলেশ মিশ্র ❑ ১১

মোদী : এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ❑ তভলীন সিং ❑ ১৩

পুরুলিয়ায় বি পি এল কার্ডও বিক্রি হচ্ছে ❑ ১৯

নীরবে সন্ত্রাস সরবে বর্তমান ❑ ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ২০

নানা রঙের নববর্ষ ❑ নির্মল কর ❑ ২৪

জানকীবল্লভের পঞ্চরত্ন ❑ ডঃ প্রণব রায় ❑ ২৪—২৫

নারী জাগরণের পথিকৃৎ জ্ঞানদানন্দিনী ❑ ইন্দিরা রায় ❑ ২৭

স্মরণিকা : আমার ঠাকুর্দা প্রেমোৎপল বিশ্বাস ❑ বনান্তিকা বিশ্বাস ❑ ২৮

দিলীপ কুমার আঢ্য : সাধারণ কার্যকর্তা অসাধারণ কাজ ❑ দিলীপ কুমার ঘোষ ❑ ২৯

দুর্নীতির সর্দার ও সর্দারণী : পরিবর্তনের ঢেউ কি দিল্লীতে পৌঁছবে? ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ৩০

একলব্য ক্রীড়া প্রকল্প : বিকাশ ও উপলব্ধি ❑ শক্তিপদ ঠাকুর ❑ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

গূঢ়পুরুষের কলম : ৮ ❑ **রাজ্য-রাজনীতি : ৯** ❑ **এইসময় : ১০** ❑
অন্যরকম : ১৮ ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑ **শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

রাজ্যের মানুষ কেন পরিবর্তন চাইছে? — ১৪

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৩ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ২৩ মে - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS RNP-048/LPWP-028/2010-12

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

দুঃশাসনের অবসান

অবশেষে দুঃশাসনের অবসান। গত ৩৪ বৎসর ধরিয়া বাংলার বুকের উপর ফ্যাসিবাদী দলতন্ত্রের যে জগদ্দল পাথর চাপিয়া বসিয়াছিল, রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেই পাথরকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। আলিমুদ্দিনওয়ালাদের যে ধরাশায়ী করা সম্ভব ইহা লইয়া অনেকেরই সন্দেহ ছিল। অনেকেই দ্যোদুল্যমান ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে পশ্চিমবঙ্গ বামপন্থীদের বলয়গ্রাস হইতে মুক্ত হইল। সত্তর বছরের সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতনের সহিত যাঁহারা এই পরিবর্তনের তুলনা করিয়াছেন, তাঁহার খুব অতিশয়োক্তি করেন নাই। কেননা বাংলার মানুষের রায়েই স্পষ্ট, তাঁহারা শুধু সরকারের পরিবর্তনই করেন নাই, সাড়ে তিন দশক পর ঘৃণাভরে সিপিএমকে বিদায় করিয়াছে। প্রায় সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভা—রাজ্য মন্ত্রিসভার ২৭ জন মন্ত্রী যেভাবে জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা এককথায় নজিরবিহীন। মরিচঝাঁপি-বিজনসেতু-ছোটোআঙ্গারিয়া-সূচপুর-নন্দীগ্রাম-নেতাইয়ের গণহত্যাকাণ্ডের রক্তে যে দুই মুখ্যমন্ত্রীর হাত রক্তাক্ত, সেই জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে যে বাংলার মানুষ ক্ষমা করে নাই, তাহা তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস জোটের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি জনাদেশ হইতেই স্পষ্ট। বাংলায় সিপিএমের কবর খুঁড়িবার ইতিহাসে নির্মমভাবে পরাজিত বুদ্ধদেবের নামও লিখিত হইবে। রাজ্য প্রশাসনের একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত আর সীমাহীন ঔদ্ধত্যেই তাঁহার এই পরিণাম।

বামফ্রন্টের আসন সংখ্যা শুধু ২৩৫ হইতে ৬২-তেই নামিয়া আসে নাই; কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর ও দার্জিলিং—এই চারটি জেলা হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। এমনকী দলগত আসন সংখ্যার বিচারেও এই রাজ্যে সিপিএম এখন তৃতীয় দল—৪০। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা—৪২। যে শোষণমুক্তির অঙ্গীকার লইয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া এই মার্কসবাদীরা একদিন ক্ষমতা দখল করিয়াছিল, সেই অমানবিক শোষণকেই তাহারা শাসনের মূলমন্ত্র করিয়া তোলে। মানুষের মুক্তির নামে মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করিবার 'কমিউনিজম' নামক এমন মিথ্যা দর্শন ও বিজ্ঞান বিশ্বে ইহার পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। সোভিয়েত রাশিয়া হইতে মাও-এর চীন পর্যন্ত ইহার সেই একই বিকৃত চেহারা। মার্কসবাদীরা তত্ত্বগতভাবে যে জাতীয়তাবিরোধী এবং ব্যবহারিক দিক হইতে অসামাজিক—বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসেই তাহা প্রমাণিত।

মার্কসবাদীরা বিশ্বের কোথাও জনসমর্থনে পুষ্ট হয় নাই। এদেশে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পর ১৯৭৭-এর নির্বাচনে প্রবল কংগ্রেস বিরোধী হাওয়ার কাঁধে চাপিয়া তাহারা এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসে। কূটকৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায় এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে গণনিধনের বর্বরতায় রাজ্যের স্থানে স্থানে মার্কসবাদী মুক্তাঞ্চল গড়িয়া তোলে। কেন্দ্রের শাসক কিংবা রাজ্যের বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেস নিজেদের স্বার্থে মূক ও বধিরের ভূমিকা পালন করে। রাজ্য বিজেপিও কোনও সদর্থক ভূমিকা পালন করিতে পারে নাই। যদিও কম্যুনিস্টরা বিজেপিকেই শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পয়লা নম্বর শত্রু বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী সরকার ও ক্যাডারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারই নেতৃত্বে তৃণমূল জোটের এই বিরাট জয়। সাড়ে তিন দশক পরে বাংলার রাজনীতিতে একটি বিরাট পট পরিবর্তন বলা যাইতে পারে।

পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়মেরই অঙ্গ। মানুষ চায় পরিবর্তন—নিজেদের স্বার্থেই। নানা অন্যায়, নানা বঞ্চনা এবং উপেক্ষার আগুন ধিক ধিক করিয়া জ্বলিতেছিল বাংলার মানুষের বুকে। পরিবর্তিত বর্তমান পরিস্থিতিই তাহার সেই ক্ষোভের আগুনকে ভোট মেশিনে প্রকাশ করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। কম্যুনিস্টদের ক্ষমতার অচলায়তন ভাঙিবার সব উপকরণই জনতা এইবার তৃণমূল জোটের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। সর্বস্তরের দুর্নীতি ও শ্লথ মানসিকতার বদল ঘটাইয়া আনিতে হইবে গতি। দুঃশাসনের অবসানে নতুন সরকারের কাছে ইহাই প্রত্যাশা।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

"না, আমার মূলমন্ত্র গঠন, বিনাশ নয়। বর্তমান ক্রিয়াকাণ্ড থেকে নূতন নূতন ক্রিয়াকাণ্ড কত্তে হবে। সকল বিষয়েরই অনন্ত উন্নতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইহাই আমার বিশ্বাস। একটা পরমাণুর পশ্চাতে সমগ্র জগতের শক্তি রয়েছে। হিন্দু জাতির ইতিহাসে বরাবর কখনই বিনাশের চেষ্টা হয়নি, গঠনেরই চেষ্টা হয়েছে। এক সম্প্রদায় বিনাশের চেষ্টা করেন, তার ফলে ভারত থেকে তাড়িত হলেন— তাঁদের নাম বৌদ্ধ। আমাদের শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি অনেক সংস্কারক হয়েছেন। তাঁরা সকলেই খুব বড় দরের সংস্কারক ছিলেন—তাঁরা সর্বদাই গঠনই করেছিলেন, তাঁরা যে দেশকাল অনুসারে সমাজ গঠন করেছিলেন ইহাই আমাদের কার্যপ্রণালীর বিশেষত্ব। আমাদের আধুনিক সংস্কারক সকলেই ইউরোপীয় বিনাশকারী সংস্কার চালাতে চেষ্টা করেন—এতে কারও কোন উপকার হবেও না, হয়ও নি। কেবল একজন মাত্র আধুনিক সংস্কারক সম্পূর্ণ গঠনকারী ছিলেন—রাজা রামমোহন রায়। হিন্দু জাতি বরাবরই বেদান্তের আদর্শ কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করে চলেছে। শুভাদৃষ্টই হউক, আর দুরদৃষ্টই হউক, সব অবস্থায় বেদান্তের এই আদর্শকে কার্যে পরিণত করবার প্রাণপণ চেষ্টাই—ভারতজীবনের সমগ্র ইতিহাস। যেখানে এমন কোন সংস্কারক সম্প্রদায় বা ধর্ম উঠেছে, যারা বেদান্তের আদর্শ ছেড়ে দিয়েছে, তারা তৎক্ষণাৎ একেবারে উড়ে গেছে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মমতা-সুনামিতে চূর্ণ বুদ্ধ-কল্পিত ২৩৫-এর অহং

নবকুমার ভট্টাচার্য

বুথফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী 'ম্যাজিক ফিগার' তো বটেই, একগুচ্ছ ইন্দ্রপতন ঘটিয়ে বুদ্ধকল্পিত ২৩৫ এর অহং গুঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দ সংখ্যা নিয়ে ক্ষমতা দখল করল তৃণমূল ও কংগ্রেস জোট। তৃণমূল একাই ১৮৪ সঙ্গে কংগ্রেস ৪২ এবং এস ইউ সি-র একজন বিধায়কও জোটের পক্ষে।

১৯৭৭-এ জরুরি অবস্থার অব্যবহিত পরে সাধারণ নির্বাচনে বাংলার মানুষ রায় দিয়েছিলেন। সেই রায়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিল ইন্দিরার কংগ্রেস। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কালো জমানার অবসান ঘটেছিল বাংলায়। শাসকবিরোধী হাওয়ায় ভর করে সেই সময় ক্ষমতায় এসেছিল বামফ্রন্ট। তারপর আর ক্ষমতার বদল হয়নি। ৭২ থেকে ৭৭ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের যে চেহারা বাংলার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, জরুরি অবস্থার নামে গণতান্ত্রিক মানুষের কণ্ঠস্বর রোধ করার সরকারি অপচেষ্টার যে নগ্নরূপ সেদিন দেখেছিল জনতা—তার বিরুদ্ধেই ৭৭ সালে তাঁরা রায় দিয়েছিলেন। তাই বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল। আজ তিন দশক পর ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হলো বাংলায়। সে সময় অত্যাচারী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে যা যা অভিযোগ তুলেছিলেন বাংলার মানুষ, এখন প্রায় সেই একই অভিযোগে অভিযুক্ত বামফ্রন্ট। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধেও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অভিযোগে এই রায়। পুরুলিয়ায় ৯টি আসনের মধ্যে ৬টিতে জিতেছে জোট, বাঁকুড়ায় জোট জিতেছে ১২টির মধ্যে সাতটিতে, পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৯টির মধ্যে জোটের দখলে রয়েছে ১২টি। আর বর্ধমানে ২৫টি আসনের মধ্যে ১৫টি পেয়েছেন জোট প্রার্থীরা। সন্ত্রাস কবলিত আরামবাগ, খানাকুল, জাঙ্গীপাড়া, খেজুরি, সর্বত্র জিতেছেন জোট প্রার্থীরা। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ—বলতে গেলে রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই আজ মমতার দখলে। পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি জেলাও আর সেইভাবে অবশিষ্ট রইল না, যাকে বামপন্থীরা আর নিজেদের দুর্গ বলে দাবি করতে পারেন। এই ভাবেই হয়তো ইতিহাস তৈরি হয়। অথচ ২০০৬-এর সকাল দেখে বোঝাই যায়নি ২০১১-তে বামফ্রন্টের এই করুণ অবস্থা হবে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও কি সেদিন ভাবতে পেরেছিলেন আগামীদিনে এত কলঙ্কিত অবস্থায় তাঁকে বিদায় নিতে হবে। প্রফুল্ল সেনের পর এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী ভোটে পরাজিত হলেন। এর জন্য দায়ী কে? এই উত্তর গবেষকরা খুঁজতে চেষ্টা করবেন কিন্তু পুরাণের কাল থেকে আজ পর্যন্ত অত্যাচারী দানবদের নিধন কোনও মহিলার হাতেই ঘটেছে। বামফ্রন্ট নিধনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই। বিগত বিধানসভা নির্বাচনগুলির প্রতিটিতেই প্রায় ৫০ শতাংশের আশেপাশে বামবিরোধী ভোট ছিল। এই ভোটগুলিকে একত্রিত করে আসনে রূপান্তরিত করতে গেলে যে কর্মোদ্যোগ নিষ্ঠা আন্তরিকতা বিশ্বাসযোগ্যতা দরকার, মমতা ছাড়া অন্য কারও তা ছিলও না। প্রদেশ কংগ্রেসের যে নেতারা এতদিন নিজেদের নাক কেটে মমতার যাত্রা ভঙ্গ করতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা এখন কি করবেন? মমতা স্বৈরতন্ত্রী, হঠকারী, মুসলিম তোষণকারী ইত্যাদি অভিযোগ করলেও সিপিএমের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত মানুষের পাশে মমতা ছাড়া বিগত তিন দশকে কাউকে দেখা যায়নি। তাই সিপিএমের বিরুদ্ধে অন্য কোনও দল বা ব্যক্তিকে মানুষ বিশ্বাসও করেনি। শেষবেলায় সিপিএমের কালো টাকার উপাখ্যানও তাই প্রত্যাখ্যান করেছে মানুষ।

একনজরে জেলার ভোট চিত্র

জেলা	মোট আসন	তৃণমূল+কংগ্রেস বিরোধী জোট	সিপিএম+শরিক বামফ্রন্ট
কোচবিহার	৯	৪+১=৫	০+৪=৪
দার্জিলিং	৬	১+২=৩	০+০=০
জলপাইগুড়ি	১২	৩+৩=৬	২+৩=৫
উঃ দিনাজপুর	৯	২+৩=৫	১+২=৩
দঃ দিনাজপুর	৬	৫+০=৫	০+১=১
মালদহ	১২	১+৮=৯	১+২=৩
মুর্শিদাবাদ	২২	১+১৪=১৫	৫+২=৭
নদীয়া	১৭	১৩+১=১৪	৩+০=৩
উত্তর ২৪ পরগণা	৩৩	২৮+১=২৯	৩+১=৪
কলকাতা	১১	১১+০=১১	০+০=০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৩১	২৬+১(suci)=২৭	৩+১=৪
পূর্ব মেদিনীপুর	১৬	১৬+০=১৬	০+০=০
হাওড়া	১৬	১৫+১=১৬	০+০=০
হুগলি	১৮	১৬+০=১৬	১+১=২
বর্ধমান	২৫	১৫+১=১৬	৮+১=৯
পশ্চিম মেদিনীপুর	১৯	৮+২=১০	৭+২=৯
পুরুলিয়া	৯	৫+২=৭	১+১=২
বাঁকুড়া	১২	৮+১=৯	৩+০=৩
বীরভূম	১১	৬+২=৮	২+১=৩
মোট	২৯৪	১৮৪+৪২=২২৭	৪০+২২=৬২

অন্যান্য : দার্জিলিং-৩, জলপাইগুড়ি-১, উত্তর দিনাজপুর-১

সি পি এম হারিয়া প্রমাণ করিল সে হারে নাই

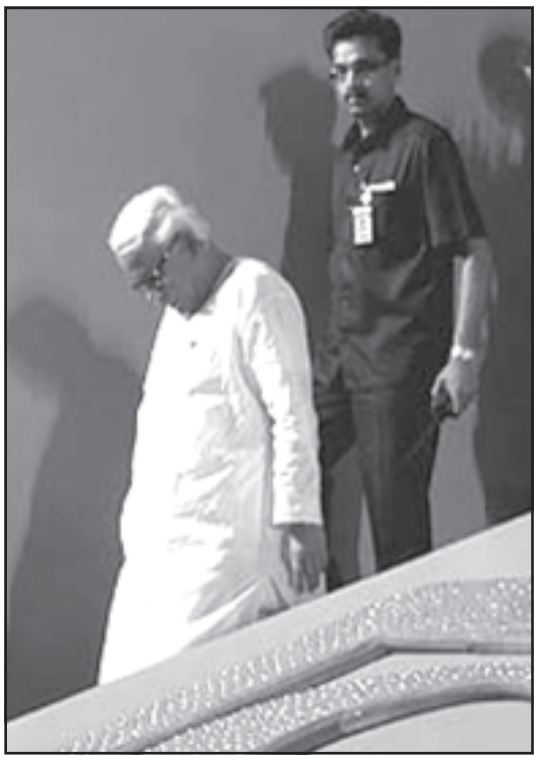

অর্ণব নাগ

মুখ্যমন্ত্রী (প্রাক্তন) বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হারিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কারণ কমিউনিস্টদের সম্পর্কে বহুশ্রুত একটি প্রবাদ বাক্য মমতাদেবী একবার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সম্পর্কে আক্ষরিক অর্থেই প্রয়োগ করে বলেছিলেন—'ওঁরা (অর্থাৎ সিপিএম) দেহত্যাগ করেন কিন্তু পদত্যাগ করেন না।' কিন্তু তাঁকে ভুল প্রমাণিত করে দেহত্যাগ করার (বামফ্রন্টের দেহত্যাগ যদিও তখন সুনিশ্চিত হয়ে গেছে) আগেই দুপুর দু'টো নাগাদ উপায়ন্তর না দেখে, একপ্রকার বাধ্য হয়েই রাজ্যপাল এম কে নারায়ণনের হাতে নিজের পদত্যাগপত্র স্বহস্তে তুলে দিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। অষ্টম বামফ্রন্টের স্বপ্ন, নিছক আর দুঃস্বপ্নই নয়; নন্দীগ্রামে সূর্যোদয় পর্বের হাড়হিম করা সন্ত্রাসের বাস্তবতার চাইতেও স্বপ্নিল। সাঁইবাড়ি কাণ্ডের আসামী মানিক রায় ওরফে অনিল বসু, গড়বেতার খলনায়ক সুশান্ত ঘোষ এবং প্রত্যাবর্তনের কাণ্ডারী গৌতম দেব প্রমুখের 'কু-বচন' আর 'কনফিডেন্স' দেখে বোঝে কার সাধ্যি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম ব্যাকফুটে আছে। লোকসভা নির্বাচনেই পরিবর্তনকামী জনাদেশ স্পষ্ট হওয়ার পরেও যেভাবে 'আত্মশুদ্ধি'র বুলি কপচে, ৩৪ বছরে যা হয়নি আগামী ৫ বছরে তাই করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, উন্নয়নশীল প্রশাসনের মুখোশ পরে সিপিএমের নেতারা আত্মতুষ্টিতে ডগমগ হয়ে অহঙ্কারের পাহাড়ে চেপে বসেছিলেন। গত ১৩ মে এক লপ্তে ২৭ মন্ত্রীর পরাজয়ে এক ধাক্কায় সেই পাহাড় থেকে খাদে পড়ে তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে বলা চলে। সিপিএমের ইন্টেলেকচুয়াল-রা (বুদ্ধিজীবী নন! এদের বরং তাত্ত্বিক বলা চলে) মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছিলেন যে, ২০০৯ লোকসভা নির্বাচনেই নাকি মমতা ব্যানার্জী'র গ্রাফ সর্বাপেক্ষা ঊর্ধবিন্দুতে আরোহণ করেছিল। এরপর সেই গ্রাফ নাকি ক্রমশ নিম্নমুখী হবে এবং ২০১১-এ বিধানসভা নির্বাচনে পৌঁছে সেই নিম্নমুখী গ্রাফ সরকার গড়ার 'ম্যাজিক ফিগার' থেকে বহুদূরে থাকবে এবং বামপন্থীদের প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত করবে (বিমান বসুর যেমন বক্তব্য দু'শ না পেলেও, ১৯৯-এর মধ্যে আসন সংখ্যা থাকবে বামফ্রন্টের!)। এই তাত্ত্বিকেরা কোন্ মুর্খের স্বর্গে বাস করেন এনিয়ে গবেষণা করলে আগামীদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি ডিগ্রী বাঁধা। নইলে গত লোকসভা নির্বাচনের পরেও 'লাল' গড় পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৯টি আসনের মধ্যে ৯টি, পুরুলিয়ায় ৯টি আসনের মধ্যে ২টি, বাঁকুড়ায় ১২টি আসনের মধ্যে ৩টি, বর্ধমানে ২৫টি আসনের মধ্যে মাত্র ৮টি আসন পেয়ে বাকিগুলিতে এবং আরামবাগ ও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিধানসভাগুলিতে বিচ্ছিরিভাবে হারতে হয় তাঁদের! (সংশ্লিষ্ট সারণী দেখলেই বিষয়টা মালুম হবে)। হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া, ধনিয়াখালি, তারকেশ্বর, পুড়শুড়া, আরামবাগ; পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল, শালবনী; পুরুলিয়ার মানবাজার, কাশীপুর, পাড়া, রঘুনাথপুর; বাঁকুড়ার শালতোড়া, ছাতনা, বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতলপুর, ইন্দা, সোনামুখী; বর্ধমানের বর্ধমান দক্ষিণ (নিরুপম সেনের কেন্দ্র), জামালপুর, মন্তেশ্বর, মেমারি, ভাতার, কেতুগ্রাম, দুর্গাপুর (পূর্ব ও পশ্চিম), রাণীগঞ্জ, বীরভূমের বোলপুর, নানুর, লাভপুর—এই সমস্ত এলাকাতেও সিপিএম হারবে ২০১১-র ১৩ মে-র আগে ভাবা সত্যিই কষ্টকর ছিল। উত্তরবঙ্গেও সিপিএমের করুণ রাগিণী যে এতটা বিষাদ সুরে বাজবে ভোটের ফল প্রকাশের আগে সেটাও ভাবা যায়নি। ৫৪টি আসনের মধ্যে ৩৮টিতেই সেখানে বামেদের পরাজয় ঘটেছে। ২০০৯-এর হিসেবে উত্তরবঙ্গে ২৩টিতে এগিয়ে ছিল বামেরা অর্থাৎ পিছিয়ে ছিল বাকি ৩১টিতে। সুতরাং আরও বাড়তি ৭টা আসনে এবার তাদের পরাজয় হয়েছে। ২০০৬-এর হিসেব ধর্তব্যের মধ্যে (যদিও সারণীতে প্রদত্ত) না আনলেও চলবে, কারণ বুদ্ধবাবুর 'আমরা ২৩৫ ওরা ৩০' মার্কা ঔদ্ধত্যের জবাব ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনেই মানুষ দিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরেও সিপিএমের দুর্গ বলে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, ২০০১-এর পর তাও আর রইল না। সত্যি কথা বলতে কী, ২০০৯-এ মমতার জয় যতটা না কষ্টার্জিত ছিল, তার থেকে বেশি ছিল 'পরিবর্তনের হাওয়া' (অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর)। কিন্তু এবারে রাজ্যজুড়ে একের পর এক লালদুর্গে ঘাসফুল ফোটার আগে সিপিএম নেতাদের হম্বি-তম্বি দেখে বোঝারই উপায় ছিল না যে ফল বেরোনোর পর সিপিএম 'পপাত চ, মমার চ' হবে। 'পরিবর্তন' বোধহয় এভাবেই আসে। পরাজিত ২৭ মন্ত্রী'র মধ্যে কে নেই! বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে অসীম দাশগুপ্ত থেকে নিরুপম সেন থেকে গৌতম দেব, প্রত্যেকেই রেকর্ড ব্যবধানে হেরেছেন। নির্বাচন কমিশনের আশীর্বাদে ক্রমশ বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতিতে পরিণত হওয়া 'রিগিং' নামক যে বস্তুটি এখনও বামফ্রন্টের ঝোলায় অবশিষ্ট রয়েছে তার দয়ায় গড়বেতায় সুশান্ত ঘোষ, নারায়ণগড়ে সূর্যকান্ত মিশ্রের কোনওক্রমে মুখরক্ষাটুকু হয়েছে। তবে বুদ্ধবাবুর ১৬, ৭৭৭ ভোটে হারাটা রেকর্ড। কারণ তিনিই পশ্চিমবাংলায় দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন পরাজিত হলেন। এক্ষেত্রে তাঁর উত্তরসূরী ছিলেন কংগ্রেসের প্রফুল্ল সেন। যিনি আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জীর কাছে হেরেছিলেন '৬৭-তে। তবে সিপিএমের সান্ত্বনা রইলো একটাই, ২০০১-এর স্লোগান 'কেশপুর শেষপুর' হলো না এবারও। রিগিং লুপ্তপ্রায় হলেও কেশপুরে সিপিএমের সন্ত্রাস ঠেকাবে কে? ২০১১-এর মমতা সিপিএমকে গো-হারান হারিয়ে প্রমাণ করে দিলেন, ২০০৯-এ সিপিএম 'প্রকৃত' হারেনি। ২০১১-য় পরপর লালদুর্গের পতন (খানিকটা বাস্তিল দুর্গের মতোই)-এর কাছে ২০০৯-এর হারটা নিতান্তই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিপর্যয় বলেই বোধ হবে। তাই লিখতে হচ্ছে, সিপিএম হারিয়া (২০১১-য়) প্রমাণ করিল সে হারে (২০০৯-য়) নাই। আরামবাগ ও অন্যান্যরা ২০১১-য় পেয়েছে, কেশপুর কি ২০১৬-য়?

পরিবর্তনকে স্বাগত জানাল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তৃণমূলের জয়কে রাজ্য বিজেপি স্বাগত জানিয়েছে। দলের রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাহুল সিনহা বলেছেন, ''পশ্চিমবঙ্গের জনতার এই রায় প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করছি। সিপিএম বিদায় নিয়েছে। তাদের ঔদ্ধত্য শেষ হয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকার ভালো কাজ করলে সহযোগিতা করবো। আবার ভালো কাজ না করলে বিরোধিতাও করবো।'' বিজেপি এই রাজ্যে এবারের নির্বাচনে কোনও আসনে জয়লাভ করতে না পারলেও সাংগঠনিক দিক থেকে খানিকটা এগিয়েছে। গত ২০০৬ সালে বিধানসভা ভোটে বিজেপি ২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এবার তা বেড়ে হয়েছে ৪ শতাংশ। তবে গত ২০০৬-এ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৬ শতাংশ ভোট। উল্লেখ্য, এবারে রাজ্যে ভোটদাতার সংখ্যা ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ।

বিজেপি-র প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বামেদের স্বৈরাচারী শাসনের পরিবর্তনের দাবি তুলেছেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন।

জরুরী অবস্থার পরবর্তী নির্বাচনে ১৯৭৭ সালে যেভাবে কংগ্রেস বিরোধী হাওয়ার দাপটে বামেরা ক্ষমতায় এসে জেঁকে বসেছিল, এবারে পরিবর্তনের হাওয়ায় এবারে রাজ্যের মানুষ বিপুল ভোটে তৃণমূলকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি বিরোধী আন্দোলন (শিল্পের জন্য বহুফসলী কৃষিজমি অধিগ্রহণ)-ই মমতাকে বামবিরোধী তথা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দমনের বিরুদ্ধে বুক-চিতিয়ে লড়াই করার প্রতিমূর্তি হিসেবে তুলে ধরেছিল। যদিও মমতার আন্দোলনে কংগ্রেস কখনও সঙ্গে ছিল না। ২০০৬ থেকে মমতার আন্দোলন ধাপে ধাপে উত্তাল হয়ে জনগণের ভাবাবেগকে যত আলোড়িত করেছিল, অন্য কোনও দল তা করে উঠতে পারেনি। এরাজ্যের মানুষই ২০০৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন, বিধানসভার উপনির্বাচন, ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচন এবং ২০১০-এ পুরসভা নির্বাচনে মমতার নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসকে মাথায় তুলে বরণ করে নিয়েছে। ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক ব্যর্থতার পর বিজেপি-তৃণমূল জোট ভেঙে যায়। তার চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। ২০০৯-এর সংসদীয় নির্বাচনে। ততদিনে কংগ্রেসের সোমেন-সুব্রতর মতো তাবড় নেতারাও মমতার দলে ভিড়ে গেছেন। এরাজ্যে কংগ্রেস সাইনবোর্ড সর্বস্ব দল হয়ে পড়েছিল। তৃণমূলের লেজুড় হয়ে মুছে যাওয়া থেকে বেঁচে গেলো রাজ্যের কংগ্রেস। বিজেপি'র খাতা খোলাও বাকীই থেকে গেল। অবশ্য, এন ডি এ জমানায় বিজেপি প্রার্থী বাদল ভট্টাচার্য উপনির্বাচনে জিতে বিধানসভায় পৌঁছেছিলেন।

লাল 'সূর্য' অস্তাচলে বামফ্রন্ট কত আসনে জয়ী (লোকসভার ক্ষেত্রে)*

জেলা	২০০৬ বিধানসভা নির্বাচন	২০০৯ লোকসভা নির্বাচন	২০১১ বিধানসভা নির্বাচন
কোচবিহার	৬	৭	৪
জলপাইগুড়ি	১১	৯	৫
দার্জিলিং	২	৩	০
উঃদিনাজপুর	৫	০	৩
দঃদিনাজপুর	৫	৩	৫
মালদা	৬	১১	৯
মুর্শিদাবাদ	১৩	১	৭
নদীয়া	৭	১	৩
উঃ ২৪ পঃ	১৯	৫	৪
দঃ ২৪ পঃ	১৬	৪	৪
কলকাতা	৪	১১	১১
হাওড়া	১৩	২	০
হুগলি	১৫	৮	২
পূঃ-মেদিনীঃ	১০	০	০
পঃ-মেদিনীঃ	১৫	১৬	৯
পুরুলিয়া	৮	৫	২
বাঁকুড়া	১১	১১	৩
বর্ধমান	১৬	১৮	৮
বীরভূম	৮	৫	৩

*২০০৯-এ লোকসভা নির্বাচন হয় আসন পুনর্বিন্যাসের (ডিলিমিটেশন) পরিপ্রেক্ষিতে। সেই কারণে ২০০৬-এর জেলাওয়াড়ি বিধানসভা আসন সংখ্যার নিরীখে ২০০৯-এর জেলাওয়াড়ি বিধানসভা আসন সংখ্যায় কিছুটা হেরফের হয়েছে। যদিও বিধানসভার মোট আসনসংখ্যা ২০০৬ ও ২০১১-তে একই (২৯৪) থাকছে। ২০০৯-এর ডিলিমিটেশনের ভিত্তিতেই ২০১১-য় ভোট হয়েছে। প্রসঙ্গত, আসন পুনর্বিন্যাসে সবচেয়ে আসন বেড়েছে মালদা জেলায়, সবচেয়ে আসন কমেছে কলকাতায়।

স্তাবকের দলই সি পি এমকে খতম করেছে

গূঢ়পুরুষের

কলম

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দোষ দেওয়া যায় না। মতলবি স্তাবকের দল চিরকালই এমন আচরণ করে থাকে। সিপিএমকে এই স্তাবকের দলই খতম করেছে। সিপিএম দলের ছোট, বড়, মেজ সব নেতারাই সর্বদা স্তাবক পরিবৃত হয়ে থাকতে থাকতে এমন একটা অবাস্তব রূপকথার জগতে বাস করছিলেন যে তাঁদের মনে হয়েছিল তাঁরা নির্বাচনে হারতে পারেন না।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পালা চুকিয়ে এখনই সময় পিছন ফিরে তাকানোর। আত্মসমীক্ষার। জয়ী এবং পরাজিত উভয় পক্ষের। দায়টা বেশি জয়ী পক্ষের। কারণ, তাঁদের হাতেই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সঁপেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যবাসী। তাঁরা বিশ্বাস করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যুবতী আশায় বুক বেঁধেছেন যে এবার তাঁরা কাজ পাবেন। পরিবারের পাশে শক্ত পায়ে দাঁড়াবেন। 'দিদি' বলেছেন যে তাঁর রাজত্বের প্রথম ১০০০ দিনের মধ্যেই অধিকাংশ বেকারকে কাজ দেবেন। 'দিদির' এই আশ্বাসকে বিশ্বাস করেছেন নবীন প্রজন্মের কর্মহীন ভোটাররা। তাঁরা দু'হাত ভরে তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দিয়েছেন। একটু ভুল হয়ে গেল। প্রার্থীদের নয়, ভোট দিয়েছেন নেত্রী মমতাকে। জয়ী তৃণমূল প্রার্থীরা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন তাঁরা ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতীক মাত্র। যেমন, ছবিতে যে মালা দেওয়া হয় তা আসলে ছবির মানুষটিকে। রং, তুলি, কাগজকে নয়। এ বড় ভয়ানক কথা। একমাত্র স্বৈরতান্ত্রিক শাসনেই এমন কথা শোনা যায়। এমন দৃশ্য দেখা যায়। ফেলে আসা বিগত শতকে জার্মানী, ইতালী, রাশিয়া, চীনে এমন নেতা-সর্বস্ব রাজনীতি মানুষ দেখেছে। যেখানে সর্বোচ্চ নেতা প্রথম এবং শেষ কথা বলেন। বাকি সকলে তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে এমন স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা থাকা উচিত নয়। একদা প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পদচুম্বন করে তাঁর দলের মন্ত্রীরা দিনের কাজ শুরু করতেন। ব্যাপারটা এতটাই দৃষ্টিকটু ছিল যে স্বয়ং ইন্দিরাও লজ্জা পেতেন। এই নিয়ে রাজধানী দিল্লীতে বিস্তর রঙ্গরসিকতা চালু ছিল। ইন্দিরার জনৈক খাস খানসামা প্রতিদিন ইন্দিরা আবাসের বাইরে এক গামলা জল নিয়ে বসতো। খানসামার বক্তব্য, এ' জল নয়, ইন্দিরার পাদোদক। মোটা টাকা প্রণামী দিয়ে সেই পাদোদক পান করে ইন্দিরা জমানার মন্ত্রীরা তাঁদের দফতরে যেতেন। তৃণমূলের জয়ী বিধায়কদের কথাবার্তায়, আচার আচরণে, অতীতের সেই ইন্দিরা জমানার কথা মনে পড়ছে। দলের নেত্রীকে তোয়াজ করার প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতা এতকাল পরে আবার দেখছি। এটি সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়।

এর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দোষ দেওয়া যায় না। মতলবি স্তাবকের দল চিরকালই এমন আচরণ করে থাকে। সিপিএমকে এই স্তাবকের দলই খতম করেছে। সিপিএম দলের ছোট, বড়, মেজ সব নেতারাই সর্বদা স্তাবক পরিবৃত হয়ে থাকতে থাকতে এমন একটা অবাস্তব রূপকথার জগতে বাস করছিলেন যে তাঁদের মনে হয়েছিল তাঁরা নির্বাচনে হারতে পারেন না। কারণ, তাঁরা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অন্য গতি নেই। বামফ্রন্টের বিকল্প নেই। স্তাবকদের এই কথাই আলিমুদ্দিনের নেতারা ধ্রুব সত্য বলে মেনে ছিলেন। সম্পূর্ণভাবে জনসম্পর্কহীন একটি রাজনৈতিক দলের যে পরিণতি হওয়া উচিত সিপিএম দলের ঠিক তাই হয়েছে। একটা কথা সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে শুনছি যে সিপিএম দলে নাকি আত্মানুসন্ধান চলছে। বিশ্বাস হয় না। তৃণমূল কংগ্রেস যদি নেত্রী-ভজা দল হয় তবে সিপিএম কর্তাভজা দল। রেজ্জাক মোল্লার মতো সিপিএমের প্রবীণ আদর্শবাদী নেতাকে সত্য কথা বলার জন্য দলীয় শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে। এমন একটি স্বৈরতান্ত্রিক দলে পরাজয়ের কারণ জানতে 'আত্মানুসন্ধান' চলছে কীভাবে বিশ্বাস করা যায়! দলের মধ্যে শহুরে নেতাদের দাপটে গ্রামবাংলার মাটির কাছাকাছি থাকা সিপিএম নেতারা মর্যাদা হারিয়ে ছিলেন। সিপিএম দলে এমন কে আছেন যিনি সোজা সাপটা বলবেন যে বুদ্ধ, অসীম, নিরুপম, গৌতমদের এবার কলকাতা ছেড়ে গ্রামে-গঞ্জে যেতে হবে। সেখানে থাকতে হবে। মানুষের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক গড়তে হবে। অমল ধবল ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, বিদেশী সুগন্ধী ছড়িয়ে, দামি গাড়ি চড়ে নয়। পায়ে হেঁটে গামছা কাঁধে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে। বাস করতে হবে। তবে লোকে বিশ্বাস করবে সিপিএম গরীবের পার্টি। সর্বহারাদের দল। কিন্তু এমন কথা বলকে কে? যে বলবে তাকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আত্মানুসন্ধানের নামে সেই পুরানো গানই বাজবে। ''পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নে আমাদের ভুল হয়েছিল'', ''মানুষের মন আমরা বুঝতে পারিনি'' ইত্যাদি বলে দায় এড়িয়ে যাওয়া হবে। বুদ্ধ-অসীম-নিরুপমরা তাঁদের অভ্যস্ত শহুরে জীবনেই থাকবেন। আলিমুদ্দিনে সান্ধ্য আড্ডায় লিকার চা সহযোগে গলাবাজি করবেন। তাঁদের প্রত্যাবর্তনের আশা ক্রমশ দুরাশায় পরিণত হবে। আগামী ২০১৬-র বিধানসভার নির্বাচনে সিপিএমকে জয়ী করার কথা বোধহয় দলের কট্টর কমরেডও ভাববেন না। একবার কল্পনায় ভাবুন যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সস্তা দামের হাফ পাঞ্জাবি গায়ে কাঁধে গামছা দিয়ে রোদে বৃষ্টিতে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছেন দলকে ক্ষমতায় ফেরাতে। কল্পনায় দেখা বুদ্ধবাবুর এই ছবি কি আপনার বাস্তব মনে হচ্ছে? এমন ছবি কি কখনও দেখা যাবে? কমরেড, এর উত্তর আপনারাই দিন।

রাজ্য রাজনীতি

দাম্ভিক-উদ্ধতদের গালে জনগণের থাপ্পড়

নিশাকর সোম

সিপিএম-কে গরীব শ্রমিক-কৃষকদের অবহেলার ফল পেতে হয়েছে। আর মুসলমানদের তোষামোদ করে তৈলাক্ত করা সত্ত্বেও মুসলমান ভোটারদের বড় অংশই তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের দিকে গেছে।

যা অবশ্যম্ভাবী ছিল তাই ঘটেছে। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট পর্যুদস্ত। এ-সম্পর্কে শুধু স্বস্তিকার এই কলামে নয়, বিভিন্ন লেখার মাধ্যমেও এই কঠোর বাস্তবের ছবি পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল। তবে আমাদের লেখা তো রাজ্যের রাজনৈতিক মাতব্বরদের চোখে পড়ে না। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পর সিপিএম-এর কঙ্কালসার অবস্থা। কেন এমন হলো তা বিশ্লেষণ করার আগে এই কলমেই লেখা হয়েছিল—''অন্তর্জলি যাত্রা''-এর পথে সিপিএম-বামফ্রন্ট।

বিগত সাতটি বামফ্রন্ট রাজত্বের আমলে—মরিচঝাঁপি, বানতলা থেকে শুরু করে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাইকাণ্ড। এইসব অত্যাচার-এর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে পড়েছে ভোটে। সিপিএম নেতারা রাজনৈতিক অলীকবাবু সেজে বলেছিলেন, ''ও কিছু নয়''। শুধু তাই নয়, পরাজিত পর্যুদস্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঔদ্ধত্যভরে বলেছিলেন, ''আমারা ২৩৫, ওরা ৩০; দেখি কি করে? ''ওদের মাথা ভেঙে দোব।'' এই তো বিরোধী দলের সম্পর্কে ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা। এমনকী বামফ্রন্টের শরিক দলগুলিকেও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। যার ফলেই পরাজিত মন্ত্রী কিরণময় নন্দ বলেছিলেন, ''বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মৃত্যু হয়েছে। ডেথ-সার্টিফিকেট দেবে জনগণ।'' হ্যাঁ জনগণই বিধানসভার ভোটের মাধ্যমেই ডেথ-সার্টিফিকেট লিখে দিল। সিপিএমের লোকেরাও ভোট দেয়নি। আর এস পি দলের পরাজিত মন্ত্রী বলেছিলেন, ''মমতার নেতৃত্বে সঠিক আন্দোলন হচ্ছে।'' বস্তুত আর এস পি তাতে আত্মিক সমর্থন দেয়। মমতার নেতৃত্বে যখন ধর্মতলা-সিঙ্গুরে ধর্না চলছে, তখন ফরওয়ার্ড ব্লক-এর মহীরুহ নেতা অশোক ঘোষ বলেছিলেন, ''মমতা আমাদের নেত্রী। সিপিএমের কর্মীরা হলো লুম্পেন।'' তখন থেকেই ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর এস পি-কে বাদ দিয়েই বামফ্রন্ট চলেছে। অথচ বিধানসভার নির্বাচনের আগে অশোক ঘোষকে জড়িয়ে ধরে বিমান বসু এগোনোর চেষ্টা করতে থাকেন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-এর ঘটনার পর সিপিআই স্পষ্টভাবে বলেছিল— ''এই ঘটনার দায়-দায়িত্ব একমাত্র সিপিএম-এর।'' তখন চৈতন্য হয়নি। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে সিপিএম-এর থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক আর এস পি আনুপাতিক হারে কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

সিপিএম-এর রাজ্যনেতৃত্ব-এর পরিকল্পনা ছিল দীপক সরকার, অমিয় পাত্রকে দিয়ে হার্মাদবাহিনীর মারফৎ ভোট আনতে। কিন্তু শান্তিতে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়াতে জনগণের রোষ ইভিএম-এ প্রকাশ পেল। কিছু ভোটারকে বলতে শোনা গেল, ''জীবনে এই প্রথম ইভিএম দেখ্‌লাম।'' কারণ সিপিএম-এর লুম্পেনরা ম্যাস্‌লম্যানরা মানুষকে ভোট কেন্দ্রে যেতে দিত না। বস্তুত সিপিএম ম্যাসলম্যানদের উপর ভিত্তি করেই নির্বাচন করতো। এতে ইন্ধন যোগালেন মহঃ সেলিম। তিনি বলেছিলেন—''নির্বাচন ওয়ান-ডে ম্যাচ, ওটা আমরা ঠিক খেলে দোব।'' রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফলের পর সিপিআই-এর সর্বভারতীয় নেতা গুরুদাস দাশগুপ্ত বলেছেন, ''সিপিএম গুন্ডামি করতেই পারে।'' এহেন মহঃ সেলিমকে সংখ্যালঘুদের বশে আনবার কাজে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ''সংখ্যালঘু দরিদ্র মানুষদের কাছে গায়ে পাউডার সুগন্ধি মেখে গেলে কিছুই ফল হয় না''—এই বক্তব্য বিজয়ীমন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লার। রেজ্জাক মোল্লা আরও বলেছেন, ''বুদ্ধদেব-নিরুপম এই বিপর্যয়ের নাটের গুরু।'' উল্লেখ করা যায়, বুদ্ধদেব মুখ্যমন্ত্রী হবার সঙ্গে সঙ্গে রতন টাটাকে ডেকে দেখা করেন। এছাড়া শিল্পমন্ত্রী হিসাবে নিরুপম সেনের সঙ্গে টাটার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। টাটার সঙ্গে বুদ্ধ-নিরুপমের কি চুক্তি হয়েছিল তা সিপিএম পার্টি এবং বামফ্রন্টকে কখনও জানানো হয়নি। কেন? গোপন রহস্যটা কি?

সিপিএম রাজনৈতিক প্রচারে দেউলিয়া হয়ে গৌতম দেব-কে দিয়ে পোড়া-কুপন, হেলিকপ্টার-এর কাহিনী বা টিভি সিরিয়াল চালিয়ে গেল। রাজনীতি চটকে গেল। শুধু তাই নয়, গৌতম দেব আস্ফালন করে বলেছিলেন—''মমতা-মুকুল রায়কে জেলে যেতে হবে।'' গৌতম দেব বলেছিলেন, ''সমস্ত সংবাদপত্র চ্যানেল বন্ধ করে দেব।'

বি টি রণদিভে বা সুন্দরাই যার আমলে গৌতমবাবুকে ''এজেন্ট প্রভোকেচার'' বলে তাড়িয়ে দিতেন না? সংবাদপত্র, সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিকদের অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছেন এবং তার ফলই পেয়েছেন। বুদ্ধ-গৌতম-নিরুপম-বিমানের কেরামতিতে বামফ্রন্ট ৬২-তে নেমেছে। এর মধ্যে সিপিএম-৪০, ফরওয়ার্ড ব্লক-১১, আর এস পি-৭, সিপিআই-২, এস পি-১ এবং ডি এস পি-১।

বিদায় সিপিএম। লেখা হয়েছিল ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি সিপিএম-কে কাট-টু-সাইজ দেখতে চায়, তাই হয়েছে। সিপিএম নাক-কান কাটা অবস্থায় পৌঁছেছে। সিপিএম পার্টি নিচের তলার বিরাট অংশ তৃণমূলে যাবেই। সিপিএম-এর পরাজয় ঘটেছে কেরলেও। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় এই দুই রাজ্যের সম্পর্কে আগেই তা অনুমান করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফলের পর পলিটব্যুরোর সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, ''এটাই আমাদের প্রাপ্য ছিল।''

সিপিএম-কে গরীব শ্রমিক-কৃষকদের অবহেলার ফল পেতে হয়েছে। আর মুসলমানদের তোষামোদ করে তৈলাক্ত করা সত্ত্বেও মুসলমান ভোটারদের বড় অংশই তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের দিকে গেছে। অন্যদিকে মমতা ব্যানার্জিকে অভিনন্দন জানানোর সঙ্গে পাঠক লক্ষ্য করবেন, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে কংগ্রেস নেই। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস তো তৃণমূল-এর আশ্রিত।

মাত্র ৯৬ ঘন্টার অনশনেই সরকার ব্যাকফুটে !
আন্না হাজারে এত শক্তি পেলেন কোথা থেকে ?

সাধন কুমার পাল

হ্যাঁ, যন্তরমন্তরই বটে। না হলে একজন সমাজসেবী মাত্র ৯৮ ঘণ্টা অনশন করে ভারতের মতো বিরাট একটি দেশের সরকারকে ব্যাকফুটে ফেলে দিয়ে অনশন মঞ্চ থেকে উঠে আসা সমস্ত দাবি মেনে নিতে বাধ্য করালেন কিভাবে? বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে এখানে লোকপাল বিলের খসড়া প্রস্তুত কমিটি ও তার সময়সীমা সংক্রান্ত দাবিদাওয়া নিয়ে অনশনে বসা প্রবীণ সমাজসেবী আন্না হাজারের কথাই বলা হচ্ছে। সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা মুখে যাই বলুক না কেন ইউ পি এ-র ম্যানেজাররা যে সরকারের এই ব্যাকফুটে চলে যাওয়াটাকে সহজে মেনে নিতে পারছে না তা কংগ্রেসের 'বিনয় কোঙার' দিগ্বিজয় সিং-এর প্রতিক্রিয়াতে পরিষ্কার।

দিগ্বিজয় সিং এই বিশিষ্ট সমাজসেবীকে বৃদ্ধ, সরল গ্রামবাসী শহুরে ধূর্ত লোকেদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন বলেই ক্ষান্ত থাকেননি, বিরাট অঙ্কের কালো টাকার প্রভাবেই যে এই অনশন কর্মসূচী আয়োজিত হয়েছে---এমন কথাও প্রকারান্তরে বুঝাতে চেয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, ব্যানারে পোস্টারে, শয়নে স্বপনে গান্ধী পরিবারের

আন্না হাজারের আদর্শবাদী জীবনশৈলী, গ্রামোন্নয়নে ব্যতিক্রমী সাফল্য, সম্মানিত নাগরিক হিসেবে বৃহত্তম সমাজের মর্যাদা ও আস্থা অর্জনই আসল শক্তি বলে অনেকে বলছেন।

সদস্যদের ছবি দেখতে অভ্যস্ত কংগ্রেসের এই নেতাটি অনশন মঞ্চের পেছনে লাগানো ভারতমাতার ছবিটিকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। এই ছবির প্রসঙ্গ টেনে পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ পুরস্কার প্রাপ্ত এই প্রবীণ গান্ধীবাদী সমাজকর্মীকে আর এস এস, বিজেপির সমর্থক হিসেবে তুলে ধরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের গায়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের আন্দোলনের তকমা সেঁটে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে এদেশের নাগরিক সমাজের অস্তিত্ব ও শক্তিকেই কটাক্ষ করেছেন। অবশ্য এর আগেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও কালো টাকা উদ্ধারের দাবীতে ঝাঁপিয়ে পড়া আরেক সমাজকর্মী যোগগুরু রামদেবের বিরুদ্ধে কালো টাকা রাখার মনগড়া অভিযোগ তুলেছিলেন। এইভাবে এই কংগ্রেস নেতা মানুষের ভরসার জায়গাগুলো নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শুধু দিগ্বিজয় সিং নন, কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ একাধিক মানুষজন লোকপাল বিল নিয়ে অরাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত দুর্নীতি বিরোধী এই আন্দোলনকে ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যেমন, আন্না হাজারে কি করতে চাইছেন তা তুলে না ধরে তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে

নানা রকম ব্যক্তিগত আক্রমণ শানিয়ে পরিস্থিতিগুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। অথচ এটা কিন্তু বলা হচ্ছে না, যে ধরনের আইন প্রণয়নের দাবিতে আন্না হাজারে আন্দোলন করছেন সেটি একবার চালু হলে ওই সঙ্গীসাথীরা দুর্নীতিগ্রস্ত হলে তারা শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না।

প্রশ্ন হলো, আন্না হাজারের মতো একজন সমাজসেবী গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত একটি সরকারকে এত কম সময়ে পর্যুদস্ত করার মতো শক্তি পেলেন কোথা থেকে? এই নিয়ে কেউ বলছেন বিগত দুমাস ধরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর সংসদের ভিতরে বাইরে লাগাতার আক্রমণই আন্না হাজারের সাফল্যের প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছিল। আবার কেউ বলছেন আন্না হাজারের আদর্শবাদী জীবনশৈলী, গ্রামোন্নয়নে ব্যতিক্রমী সাফল্য সম্মানিত নাগরিক হিসেবে বৃহত্তম সমাজের মর্যাদা ও আস্থা অর্জন করেছে। অনশন করতে গিয়ে এহেন একজন মানুষের কিছু একটা হয়ে গেলে স্বাধীনোত্তর ভারতের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত এই ইউপিএ সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি সামলে ওঠা সম্ভব হবে না। এই পরিস্থিতিতে লোকপাল বিল নিয়ে নাগরিক সমাজের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া সরকারের সামনে কোনও বিকল্প ছিল না। পরিবেশ পরিস্থিতি গত এই সমস্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াও আন্না হাজারের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের একটি মনস্তাত্ত্বিক দিকও আছে। যাতে অবশ্যই দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকদের জন্য যথেষ্ট ভয়ের উপাদান আছে। কারণ, যে মনস্তাত্ত্বিক কারণে আরব দুনিয়ার দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ আছড়ে পড়ছে, এম. এল. এ ফাটাকেষ্টর মতো সিনেমা নাটক জনপ্রিয় হচ্ছে, ঠিক একই রকম মনস্তাত্ত্বিক কারণেই যে আন্না হাজারের আন্দোলনে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ছে এ বিষয়ে খুব একটা দ্বিমতের অবকাশ নেই।

আসলে প্রচলিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা বোধহয় এটাই যে এখানে শাসক আর শাসিতের মধ্যে ফারাকটা যেন সেই রাজতন্ত্রের রাজা আর প্রজার মতো। ভোটের সময় এরা মানুষের কাছে আসলেও একবার নির্বাচিত সরকারের ভাবনাচিন্তা ও কার্যপ্রণালীর মধ্যে অনেক সময় মানুষের সমস্যা ও দুশ্চিন্তার প্রতিফলন থাকে না। ফলে শাসন বিভাগের কাজ আদালতকে হস্তক্ষেপ করে জনস্বার্থ রক্ষা করতে হয়েছে, এমন উদাহরণের অভাব নেই। স্বাধীনোত্তর ভারতে দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনের জেরে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন দু-দুটো কেন্দ্রীয় সরকারের পতনও হয়েছে। কিন্তু এতেও দুর্নীতি তো কমেইনি, উল্টে দুর্নীতির পুরোনো রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন নতুন রেকর্ড তৈরী হচ্ছে। মানুষ দেখছে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিতে অভিযুক্তরা উচ্চপদে আসীন হয়ে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভিজিলেন্স কমিশন, সি বি আই-এর মতো সংস্থাগুলো কোনও ভাবেই এই বেড়ে চলা দুর্নীতিতে লাগাম টানতে পারছে না। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য সরকারের তরফে অনেকবার সংসদে লোকপাল বিল পেশ হলেও বিভিন্ন অজুহাতে এটিকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠানো হয়েছে।

এরকম একটি প্রেক্ষাপটে আন্না হাজারে প্রস্তাবিত লোকপাল বিলের মধ্যে এমন কিছু বিষয় মানুষের নজরে এসেছে যাতে কিনা মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী, আমলা, জনপ্রতিনিধিরা শাস্তি পাবেনই এমন একটি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। যেমন, ১। প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সহ মন্ত্রীসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা এই বিলে রয়েছে, যা কিনা সরকার প্রস্তাবিত জনলোকপাল বিলে ছিল না। ২। যে কোনও অভিযোগের তদন্ত ও অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তিদানের বিষয়টি দু-বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য যা ক্ষয়ক্ষতি হবে সেটা তার কাছ থেকেই আদায় করা হবে। যদি প্রমাণ হয় যে কোনও ব্যক্তি দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পত্তির মালিক হয়েছে, তাহলে সেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড বা পাশপোর্টের মতো বিষয়গুলো নিয়ে কোনও সরকারী কর্মী মানুষকে হয়রানি করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। সরকারি বরাদ্দে রাস্তাঘাট সহ কোনও নির্মাণ কাজ সম্পর্কে অভিযোগ উঠলে এবং তা প্রমাণিত হলে এর জন্য দায়ী সরকারী কর্মচারীর শাস্তি সহ সংশ্লিষ্ট কাজে ক্ষয়ক্ষতির টাকাও তার কাছ থেকে আদায় করা হবে। ৩। কেন্দ্রের জন্য লোকপাল ও রাজ্যগুলোর জন্য লোকযুক্ত গঠন করার প্রস্তাব রয়েছে এই বিলে। স্বশাসিত এই সংস্থাগুলোর তদন্ত চালানোর মতো নিজস্ব পরিকাঠামো থাকবে। লোকপালের কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে দু'মাসের মধ্যে তদন্ত করে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার শাস্তি দানের ব্যবস্থা থাকছে। মোট কথা পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সরকারি অর্থ নয়ছয়কারী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান থেকে শুরু করে তার কাছ থেকে নয়ছয় কৃত অর্থ আদায় করার ব্যবস্থা থাকছে এই বিলে।

সব মিলে বলা যায়, রাজনীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠা দুর্জন-দুর্নীতি- দুরভিসন্ধির ত্রিকোণ ফাঁসে বর্তমান শাসন ব্যবস্থাটি এমন ভাবে আটকে গেছে, যে মানুষ এর থেকে মুক্তি চায়। যে ভাবেই হোক মানুষ এটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তির মাধ্যমে এই ফাঁস আলগা হওয়া সম্ভব নয়। আন্না হাজারের মতো অরাজনৈতিক ব্যক্তির আন্দোলনের মধ্যে আমজনতা দুর্নীতির ঘূর্ণিপাকে হাঁসফাস করতে থাকা শাসন ব্যবস্থাটিকে মুক্ত করা এবং সেই সঙ্গে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা ক্ষমতাধরদের বিচারের কাঠগড়ায় দেখার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আমজনতার এই স্বপ্নের মধ্যেই যে আন্না হাজারের দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে এই বিষয়ে বোধহয় কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। সবশেষে আর যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসমাজের এই জেদ শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই হবে না। দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের বিরুদ্ধে যদি সামাজিক ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করা যায় তবেই বোধহয় দুর্নীতি নামক এই ক্যান্সারকে সমাজ জীবন থেকে নির্মূল করা সম্ভব হবে।

লক্ষ্মী ফাঁদের ঘরে বাঁধা

অন্য রকম

লক্ষ্মী মিত্তাল

রবি রুইয়া

স্বরাজ পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এবার নিয়ে পরপর সাতবছর প্রথমে রয়েছেন তিনি। নাম লক্ষ্মী মিত্তাল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইংল্যান্ডবাসী ইস্পাত ব্যবসায়ী। যুক্তরাজ্যের ধনী ব্যক্তিদের যে তালিকা বেরিয়েছে তাতে তাঁর নাম প্রথমে রয়েছে। এটা যদিও নতুন ব্যাপার নয়। সাতবছর ধরে এভাবে শীর্ষে অবস্থান তাঁর। আনুমানিক তিনি ১৭.৫১ বিলিয়ন পাউন্ডের মালিক—এমন হিসেব করা হয়েছে। অবশ্য তাঁর অর্থের পরিমাণ এর মধ্যে এক বছরে ৪.৯৩ বিলিয়ন কমে গিয়েছিল।

২০১১ সালের ধনীদের তালিকা সেদেশের কাগজ 'দি সানডে টাইমস'-এ প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে মিত্তালের অর্থের পরিমাণ ২০১০ সালের তুলনায় কমে গেছে। ২০১০ সালে ছিল ২২.৪৫ বিলিয়ন পাউন্ড।

ষাট বছর বয়সী মিত্তাল হলেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইস্পাত উৎপাদক সংস্থার প্রধান। তিনি অনেকরকম উদ্যোগ নিয়েছেন। ভাস্কর অনীশ কাপুরকে দিয়ে পূর্ব লন্ডনের অলিম্পিক পার্কে একটি অসাধারণ ভাস্কর্য তৈরি করিয়েছেন। তাতে দেড় হাজার টন ইস্পাত লেগেছে। তিনি সবুজে ঢাকা সারে এলাকায় ৩ কোটি পাউন্ড দামের বাড়ি তৈরি করতে চান। এখন যে বাড়িতে থাকেন সেটা কিনেছিলেন ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড দিয়ে।

অনাবাসী ভারতীয় স্বরাজ পালের অর্থের পরিমাণ বেড়েছে। ৩০ কোটি পাউন্ড থেকে ৮৫ কোটি পাউন্ড হয়েছে। আরেক ভারতীয় ব্যবসায়ীগোষ্ঠী হিন্দুজারা যুক্তরাজ্যের ধনীর তালিকায় নবম স্থানে রয়েছে। ওই সংস্থা তালিকাভুক্ত হয়েছে এবারই প্রথম। যুক্তরাজ্যে হিন্দুজাগোষ্ঠী ব্যবসা পত্তন করে ১৯১৪ সালে। বেশ দাপটের সঙ্গে ৯৭ বছর ধরে চলেছে প্রয়াত পরমানন্দ হিন্দুজার গড়া ব্যবসা।

সৌভাগ্যবান ব্যবসায়ীর তালিকায় আরেকটি নাম রবি রুইয়া। ৯ বিলিয়ান পাউন্ডের মালিক। বেদান্ত রিসোর্সেস্-এর অনিল আগরওয়াল আগের বছর ২৯ কোটি পাউন্ডের মালিক ছিলেন। এখন ৩.৮১ বিলিয়ন পাউন্ডের মালিকানা তাঁর।

জানা যাচ্ছে ব্রিটেনের ১,০০০ ধনী মানুষের সামগ্রিক আয় গত বছরের তুলনায় ১৮ শতাংশ বেড়েছে। পরিমাণ ৩৯৫.৮ বিলিয়ন পাউন্ড। গত বছরের তুলনায় বেড়েছে ৬০.২ বিলিয়ন পাউন্ড।

ত্রিবিধ আগ্রাসনে বিপন্ন ভারত

অম্লান কুসুম ঘোষ

কোনও মানুষের শরীর যদি ভয়ঙ্কর কোনও ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয় আর সেই মানুষটি যদি সেই ব্যাধি সম্পর্কে উদাসীন থাকেন তাহলে তিনি যেমন কালক্রমে সেই ব্যাধির শিকার হয়ে পড়েন, ভারতবর্ষ তেমন বৈদেশিক নানা শক্তি ও অভ্যন্তরীণ পঞ্চম বাহিনীর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে উদাসীন থেকে এক গভীর চক্রান্তের শিকার হতে চলেছে। ভারতবর্ষের সমস্যা ত্রিবিধ। প্রথমত, মুসলিম আগ্রাসন। ভারতের কাছে তিন-তিনবার যুদ্ধে পরাজয়ের পর পাকিস্তান এবং অন্যান্য ভারতবিরোধী মুসলিম সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী তাদের রণকৌশল বদলেছে। তারা বুঝতে পেরেছে ভারতকে তারা সরাসরি যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে না। তার বদলে তারা চাইছে ভারতের প্রশাসনযন্ত্রের এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিসমূহের মধ্যে নিজেদের অনুগত লোকের সংখ্যা বাড়াতে এবং অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়াতে যাতে ভারতের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়। এই দুটি পন্থায় মুসলিম আগ্রাসনকারীরা ভারতকে গ্রাস করতে চাইছে। একটা বড় খাদ্যবস্তুকে খাওয়ার সময় আমরা যেমন গোটা বস্তুটিকে একসঙ্গে না খেয়ে তাকে পাশ থেকে কেটে টুকরো করে ধীরে ধীরে খাই, সেরকম মুসলিম আগ্রাসনকারীরা ভারতের কয়েকটি প্রদেশকে লক্ষ্য হিসেবে রেখে সেগুলিকে ধীরে ধীরে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতকে দুর্বল করতে চাইছে। ওদের আক্রমণের প্রথম নিশানা হলো কাশ্মীর। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা গৃহীত আত্মঘাতী নীতির ফলে কাশ্মীরে আজও ৩৭০ ধারা বজায় আছে। ফলে স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি ভারতের অন্য প্রদেশের কোনও অধিবাসী কাশ্মীরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেনি। ফলে কাশ্মীরে মুসলিম জনসংখ্যা বরাবরই বেশি থেকে গেছে। তার ওপর আশির দশক থেকে পাকিস্তান দু'রকম পদ্ধতিতে কাশ্মীরকে আরও মুসলিম প্রধান করার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রথমত, তারা প্রত্যক্ষ মদতে সন্ত্রাসবাদীদের দিয়ে কাশ্মীরি হিন্দুদের ব্যাপক হারে নিধন করতে শুরু করেছে। ফলে অবশিষ্ট হিন্দুরা বাধ্য হয়ে কাশ্মীর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। দ্বিতীয়ত, তারা কাশ্মীরে প্রচুর সংখ্যায় মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে দিয়ে চলেছে। ফলস্বরূপ কাশ্মীর আজ প্রায় হিন্দুশূন্য। এখন সেখানে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদতে শুরু হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। জনসংখ্যার প্রায় পুরোটাই মুসলিম হওয়ায় সেই আন্দোলন সেখানে সহজেই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় রাজনীতিকদের একটা অংশের অদ্ভুত কার্যকলাপ লক্ষ্য করা গেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদেশী শক্তির দ্বারা চালিত এই রাজনীতিবিদরা কাশ্মীরের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে প্রকাশ্যেই সমর্থন করছে। পেট্রোডলার-পুষ্ট ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বপক্ষে দেশে ও বিদেশে নিয়মিত প্রচার চালাচ্ছে। ফলে কাশ্মীর আজ ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন।

মুসলিম আগ্রাসনকারীদের আক্রমণের দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো অসম। অসম দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী মুসলিমরা অনুপ্রবেশ চালিয়েছে। অসমের রাজনীতিকদের একাংশ মুসলিম ভোটের লোভে দীর্ঘদিন ধরে এই অনুপ্রবেশকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব পাইয়ে দিয়েছে, ভোটার কার্ড করে দিয়েছে, রেশন কার্ড করে দিয়েছে। ফলে অসমে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৩ শতাংশ মুসলিম।

মুসলিম আগ্রাসনকারীদের আক্রমণের দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো অসম। অসম দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী মুসলিমরা অনুপ্রবেশ চালিয়েছে। অসমের রাজনীতিকদের একাংশ মুসলিম ভোটের লোভে দীর্ঘদিন ধরে এই অনুপ্রবেশকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব পাইয়ে দিয়েছে, ভোটার কার্ড করে দিয়েছে, রেশন কার্ড করে দিয়েছে। ফলে অসমে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৩ শতাংশ মুসলিম। এই মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা স্থানীয় হিন্দুদের জায়গা জমি জবর দখল করছে, বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের স্থাবর সম্পত্তি গায়ের জোরে বেআইনিভাবে দখল করছে আর তথাকথিত সেকুলার রাজনীতিকদের একাংশ এই কাজকে সমর্থন করছে। ফলে অসমে এখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্তা মুসলিমরাই। এছাড়া অসমের বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংস্থাকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকার সাহায্য করছে, বিনিময়ে তারা অসমে বসবাসকারী ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেদের বিতাড়িত করছে। এই উগ্রপন্থী সংস্থাগুলি মুখে অসমের ভূমিপুত্রদের কথা বললেও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে এরা কিছু বলে না। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার এই উগ্রপন্থী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ফলে অন-অসমীয়া হিন্দুরা দলে দলে অসম থেকে পালিয়ে আসছে। একদিকে মুসলিম অনুপ্রবেশ অন্যদিকে হিন্দু বিতাড়ন, ফলে অসমে এখন হিন্দুরা কোণঠাসা এবং অসমে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সক্রিয় হয়ে

উঠছে। অসমও আজ ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন।

মুসলিম আগ্রাসনকারীদের তৃতীয় লক্ষ্য হলো কেরল। প্রদেশটি বহুকাল ধরেই মুসলিম অধ্যুষিত। ইদানিং মুসলিম আগ্রাসনকারীরা সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়িয়ে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এখানে মুসলিম আগ্রাসনকারীদের অস্ত্র আলাদা। হিন্দু মেয়েদের ছদ্ম ভালবাসায় ভুলিয়ে বিয়ের নাম করে মধ্যপ্রাচ্যে পাচার করে দিচ্ছে। কেরলের মুসলিম যুবকেরা। এভাবে তারা হিন্দু মেয়েদের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে ফলে হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ কেরলের জনসংখ্যায় মুসলিম অনুপাত বাড়ছে। মুসলিম আগ্রাসনকারীরা পুরো পদ্ধতিটির নাম দিয়েছে 'লাভ জেহাদ'। স্থানীয় রাজনীতিকরা পুরো ব্যাপারটি সম্পর্কে উদাসীন। কেরল কাশ্মীর বা অসমের মতো বিপদাপন্ন না হলেও বিপদের সূত্রপাত সেখানেও ঘটেছে বলা যায়।

মুসলিম আগ্রাসনকারীদের চতুর্থ লক্ষ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ। এখানেও অসমের মতো একই পদ্ধতিতে মুসলিম অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে আগ্রাসনকারীরা। এখানেও রাজনীতিকদের বরাভয় হস্ত তাদের সাহস জোগাচ্ছে। গোটা রাজ্য এখনই বিপদাপন্ন না হলেও সীমান্তবর্তী কিছু জেলা ইতিমধ্যেই বিপদের সম্মুখীন। মুর্শিদাবাদকে আগ্রাসনকারীরা ইতিমধ্যেই মুসলিমাবাদ বলতে শুরু করেছে। অনত্রও দেগঙ্গার মতো কিছু জায়গায় হিন্দুরা উদ্বাস্তু হতে শুরু করেছে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যেও অদূর ভবিষ্যতে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দেবার সম্ভাবনা প্রবল।

মুসলিম আগ্রাসনকারীদের লক্ষ্য যদি সফল হয় তবে ভারতের কী কী ক্ষতি হবে দেখা যাক্। প্রথমত, কাশ্মীর যদি ভারতের হস্তচ্যুত হয় তাহলে ভৌগোলিক দিক থেকে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান ভারতের হস্তচ্যুত হবে। কাশ্মীরের সঙ্গে পাকিস্তান, চীন ও আফগানিস্তানের সীমানা রয়েছে। ফলে কাশ্মীর যার হাতে থাকবে সেই দেশ এশীয় রাজনীতিতে একটা বিশেষ গুরুত্ব পাবে, কাশ্মীর হস্তচ্যুত হলে ভারত সেই গুরুত্ব হারাবে। এছাড়া কাশ্মীরের সামরিক গুরুত্বও অপরিসীম। কাশ্মীর পাকিস্তানের হাতে গেলে জম্মু ও হিমাচল প্রদেশের নিরাপত্তা বজায় রাখা কঠিন হবে। তাছাড়াও কাশ্মীরের অর্থনৈতিক গুরুত্বও অসীম। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত কাশ্মীরে পর্যটনশিল্পের চরম বিকাশ হওয়া সম্ভব এবং তার থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও আমদানী হতে পারে। কিন্তু কাশ্মীর পাকিস্তানের হাতে গেলে তা আর সম্ভব হবে না। ফলে ভারতের প্রচুর ক্ষতি হবে। দ্বিতীয়ত, যদি অসম ভারতের হস্তচ্যুত হয় তাহলে ভারত বনজ ও কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ এক প্রদেশ হারাবে। এছাড়াও ব্রহ্মপুত্র নদের ওপরও ভারত অধিকার হারাবে। তৃতীয়ত, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী অশান্তি শুরু হলে ভারতের অর্থনীতিতে তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে। অতএব মুসলিম আগ্রাসনকারীরা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলে ভারতের সমূহ ক্ষতি।

ভারতের তৃতীয় ও সর্বশেষ বিপদ হলো চীনা আগ্রাসন। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে ভারতের তৎকালীন অপরিণামদর্শী সরকারকে পরাজিত করে চীন ভারতের এক বিশাল অংশ দখল করে রেখেছে। এছাড়া পাকিস্তানের কাছ থেকে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের একটা অংশ তারা পেয়েছে। এরপর এখন চীনের আগ্রাসনের লক্ষ্য হলো অরুণাচল প্রদেশকে তিব্বতের অংশ বলে প্রচার চালিয়ে চীন তাকে নিজের বলে দাবি করছে, এবং এ কথা তারা বৈদেশিক মহলে বারংবার জানিয়ে ভারতের ওপর কূটনৈতিক চাপও সৃষ্টি করছে।

ভারতের দ্বিতীয় সমস্যা খৃস্টান আগ্রাসন। ভারতে খৃস্টান আগ্রাসন প্রধানত দু' জায়গায় ঘটছে—১. উত্তর-পূর্ব ভারত, ২. মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় ওড়িশা ঝাড়খণ্ডের খনিসমৃদ্ধ অঞ্চল।

উত্তর-পূর্ব ভারতে খৃস্টান আগ্রাসন শুরু হয়েছিল সেই বৃটিশ আমল থেকেই। বৃটিশ আমলে সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের ঢুকতে দিত না, আর খৃস্টান মিশনারীদের দলে দলে সেখানে পাঠাত। ফলত, দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় দেখা গেল ওই সমস্ত অঞ্চলের স্থানীয় উপজাতিদের অধিকাংশই খৃস্টান হয়ে গেছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার এই বিষয়টি সম্পর্কে উদাসীন থাকল। সেই সুযোগে ওই সমস্ত অঞ্চলে বহু খৃস্টান সন্ত্রাসবাদী দলের জন্ম হলো। তারা ভারত থেকে বেরিয়ে যাবার দাবি তুলল এবং ওই সমস্ত অঞ্চলে ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেদের বসবাস কার্যত অসম্ভব করে তুলল। এই উগ্রপন্থী সংস্থাগুলি এখন অসম্ভব রকম সক্রিয় এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট হয়ে প্রচণ্ড শক্তিশালী। কেন্দ্রীয় সরকার এদের দমনে কোনও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বরং এদের তোয়াজ করে চলেছে। ফলে নাগাল্যান্ডের মতো রাজ্যে সেখানে প্রায় ১০০ শতাংশ লোক আজ খৃস্টান। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সেখানে খুব তীব্র। উত্তর-পূর্ব ভারতে ৩৭০ ধারা জারি না থাকলেও জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির দাপটে সেখানে অঘোষিত ৩৭০ ধারা চলছে। এককথায় উত্তর-পূর্ব ভারত বাকি ভারত থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারত তাই আজ খুবই বিপদাপন্ন।

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড ওড়িশার খনিসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে মূলত, বনবাসীদের বসবাস। ইংরেজ আমলে এই অঞ্চলগুলিতেও ভারতের অন্য অঞ্চলের লোককে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হোত না এবং দলে দলে খৃস্টান মিশনারী পাঠানো হোত। স্বাধীনতার পরে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম-এর মতো প্রকৃত সেবামূলক সংস্থা এখানে কাজ করতে গেলে স্থানীয় চার্চগুলি তীব্রভাবে বাধা দেয়। সেই বাধা বেশিরভাগ সময়ে আইনের সীমারেখাও অতিক্রম করে। বর্তমানে এসমস্ত অঞ্চলের চার্চগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাওবাদী উগ্রপন্থীদের সহায়তা করে ভারতবিরোধী আন্দোলন চালাচ্ছে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই অঞ্চল এখনও উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো খৃস্টান উগ্রপন্থীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়নি, কিন্তু এখানকার ভাগ্যাকাশেও দুর্যোগের মেঘ দেখা যাচ্ছে।

খৃস্টান আগ্রাসনকারীরা তাদের লক্ষ্যে সফল হলে ভারতের কী কী ক্ষতি

হবে দেখা যাক্। উত্তর-পূর্ব ভারত ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চল ভারতের হস্তচ্যুত হলে ভারত ব্রহ্মদেশের সঙ্গে সীমানা হারিয়ে ফেলবে, এছাড়া অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগ ক্ষীণ হবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদও প্রচুর। বনজ ও কৃষিজ সম্পদে ভরপুর এই অঞ্চল ভারতের হাতছাড়া হলে ভারতের অর্থনীতিতে ও প্রচুর প্রভাব পড়বে। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ের খনিজ সম্পদ পরিপূর্ণ এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী অশান্তি বজায় থাকলে সেখানকার খনিজ সম্পাদকে ভারত সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ভারতের তৃতীয় ও সর্বশেষ বিপদ হলো চীনা আগ্রাসন। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে ভারতের তৎকালীন অপরিণামদর্শী সরকারকে পরাজিত করে চীন ভারতের এক বিশাল অংশ দখল করে রেখেছে। এছাড়া পাকিস্তানের কাছ থেকে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের একটা অংশ তারা পেয়েছে। এরপর এখন চীনের আগ্রাসনের লক্ষ্য হলো অরুণাচল প্রদেশকে তিব্বতের অংশ বলে প্রচার চালিয়ে চীন তাকে নিজের বলে দাবি করছে, এবং এ কথা তারা বৈদেশিক মহলে বারংবার জানিয়ে ভারতের ওপর কূটনৈতিক চাপও সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি সিকিমের উপরও চীনের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে। ভারত সরকার চীনের এই আগ্রাসনের সাহসী প্রতিবাদ করার বদলে আপোষের রাস্তায় হাঁটছে। ফলে অরুণাচল প্রদেশ ও সিকিমের ভাগ্যাকাশেও বিপদের ছায়া দেখা যাচ্ছে।

চীনা আগ্রাসন সফল হলে ভারতের প্রচুর ক্ষতি হবে। প্রথমত, অরুণাচল প্রদেশ জলসম্পদে পরিপূর্ণ এবং অরুণাচল প্রদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সুযোগ আছে। বছর চারেক আগে ভারতীয় অপ্রচলিত শক্তিমন্ত্রকের করা সমীক্ষা অনুযায়ী গোটা অরুণাচল প্রদেশে বছরে প্রায় ১ লক্ষ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব যা দেশের মোট শক্তিচাহিদার অর্ধেকেরও বেশি। সারা বিশ্বে তাপবিদ্যুতের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ জ্বালানীর পরিমাণ কমে আসছে, ফলে অদূর ভবিষ্যতে জলবিদ্যুৎ-এর মতো বিকল্প শক্তিই দেশের শক্তির চাহিদা পূরণ করবে। সেই সময় অরুণাচল প্রদেশ আমাদের হাতে না থাকে তাহলে আমরা আমাদের দেশের শক্তির চাহিদা পূরণ করতে পারব না। এককথায় বলা যায় অরুণাচল প্রদেশ হাতছাড়া হলে শক্তি উৎপাদনের একটি সোনার খনি ভারতের হাতছাড়া হবে। আর সিকিম যদি চীনের করাল গ্রাসে চলে যায় তাহলে বিপদ অন্যত্র। প্রথমত, সিকিম চীনের হাতে গেলে ভূটানের তিন দিকের সীমানা চীনের অধিকারে যাবে। ফলে এখন পর্যন্ত ভারতের প্রভাবাধীন ভূটানের ওপর চীন সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। ফলস্বরূপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে ভারত কিছুটা ধাক্কা খাবে। দ্বিতীয়ত, ১৯৬২-এর যুদ্ধের ফলে ভারতের অধিকারে থাকা হিমালয়ের একটা বড় অংশ চীনের দখলে চলে গেছে, এককালের ভারতবন্ধু নেপালও এখন চীনের প্রভাবাধীন, এরপর সিকিম ও যদি চীনের গ্রাসে চলে যায় তাহলে হিমালয়ের প্রায় পুরোটাই চীনের দখলে চলে যাবে। ভারত-চীনের প্রাকৃতিক বিভাজনরেখা হিমালয়ের দখল চীনের হাতে চলে গেলে সামরিক অবস্থানগত দিক দিয়ে ভারত খুব অস্বস্তিতে থাকবে। তৃতীয়ত, বিশ্ব- উষ্ণায়নের কারণে গোটা বিশ্বে মিষ্টি জলের পরিমাণ কমছে, ভবিষ্যতে মিষ্টি জলের উৎস যে দেশের দখলে থাকবে তারাই হবে বিশ্ব-অর্থনীতির অন্যতম নিয়ন্তা। যে কারণে বিজ্ঞানীরা বলছেন আজকের পৃথিবী যদি তেলের হয় আগামী পৃথিবী তাহলে জলের হবে। এই রকম পরিস্থিতিতে মিষ্টি জলের অন্যতম প্রধান উৎস হিমালয়ের দখল চীনের হাতে চলে যাওয়া ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর হবে। চতুর্থত, সিকিম অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র, চীন সিকিম গ্রাস করে নিলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা আয় অনেক হ্রাস পাবে। সবমিলিয়ে চীনা আগ্রাসন ভারতের ভবিষ্যৎকে বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এই ত্রিবিধ সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকার উদাসীন। সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রাজনীতিকদের এই ঔদাসীন্য কিন্তু অজ্ঞতাপ্রসূত নয়। ব্যক্তিগতভাবে বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের টোপে ও সংখ্যালঘু ভোটের লোভে সব জেনে শুনে এই রাজনীতিকরা উদাসীন হবার ভান করছে। আর দেশের সংবাদ মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীকূল? তারা কলম ও মগজ বিক্রয় করেছে দেশের তথাকথিত শত্রুদের কাছে। তাই নিজের দেশের এই ত্রিবিধ সমস্যা তাদের চোখে পড়ে না। কোরিয়া থেকে লিবিয়া পর্যন্ত বিশ্বের বাকি সবদেশের সমস্যা নিয়ে তারা সদাচিন্তিত। ব্যতিক্রমী দু'একজন যদি ভুলক্রমে ভারতের এই সমস্যাগুলির দিকে দৃক্‌পাত করেন, অন্যরা তখনই গেল গেল রবে তাঁর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হন। আর দেশের মেরুদণ্ড যুবসমাজ? তাদের দৃষ্টি বড় ক্ষুদ্র, নিজেদের 'কেরিয়ার' ছাড়া আর কিছু নিয়ে তারা চিন্তিত নয়। ফলস্বরূপ ভারতের ভাগ্যাকাশে ঘনীভূত হওয়া সঙ্কটের মেঘ দূরীভূত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

বাঙালীর পরিবর্তনের পাঠ এখনও শেষ হয়নি

শিবাজী গুপ্ত

জগৎ পরিবর্তনশীল। প্রাকৃতিক নিয়মেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নানা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। সেটা ঠেকিয়ে রাখা কারও সাধ্য নেই। অপরিবর্তন বা স্থিতিশীল হয়ে থাকা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করেই পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এককথায় পরিবর্তনেই জীবনের লক্ষণ প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়।

আজ যারা পরিবর্তন, পরিবর্তন বলে চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করছে, তারাও পরিবর্তনের ফসল। ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটেছিল তারই উদ্বৃত ফসল বর্তমানের পরিবর্তনকামীরা।

কিন্তু সর্বশেষ পরিবর্তনের কোনও সুফল বাঙালীর ভাগ্যে জুটবে কিনা সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। কারণ, বাঙালী জীবনে কোনও পরিবর্তনই অতীতে সুফল প্রসব করেনি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় ১২০১-০২ সালে বাংলায় যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে; হিন্দু রাজত্বের অবসানে বাংলায় যে মুসলমান শাসনের অভ্যুত্থান ঘটে, তা বাঙালী জীবনে চিরস্থায়ী দুঃখ ও বিপর্যয়ের কারণ হয়। পাঁচ শতাধিক বছরের ইসলামী শাসন বাঙালীদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। এই হিন্দুবিদ্বেষী শাসনের দু-শ বছরের মধ্যেই বাঙালী জাতির মাথা উঁচু করে চলার দিন শেষ হয়ে যায়। এ সময়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকেও জীবনহানির আশঙ্কায় বাংলা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য ওড়িশায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

আর সাধারণ বাঙালী? যাদের কাছে সেকালে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের গ্রামে যাওয়া বিদেশযাত্রা বলে গণ্য হোত, তাদের তো আর ভিন্ রাজ্যে— অবশ্যই হিন্দু—আশ্রয় নিয়ে প্রাণ-মান-ধর্ম রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, তাদের কি গতি হলো? তারা প্রাণ দিয়ে ধর্ম রক্ষা করতে পারেনি। পরিবর্তে ধর্ম দিয়ে প্রাণরক্ষা করেছে—বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে। ফলে বাঙালী জীবনে এই পরিবর্তন আশীর্বাদরূপে না এসে অভিশাপরূপেই এসেছিল। কিন্তু পরিবর্তন তো বটেই! এই অভিশপ্ত পরিবর্তনের ধারা বজায় ছিল—দীর্ঘ প্রায় পাঁচশ' বছর। সমাপ্তি ঘটে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর আমবাগানে ইসলামী অপশাসনের অবসানে। বাঙালীর জীবনে এলো মহাপরিবর্তন। অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণের পরিবর্তন। প্রায় দু-শ বছর (১৭৫৭-১৯৪৭) বাঙালী পরিবর্তনের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে সারা ভারতে সর্বক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।

কিন্তু ১৯৪৭ সালে যে রক্তক্ষয়ী পরিবর্তন ঘটল, তার পরিণতিতে আজ বাঙালীর অস্তিত্বই বিপন্ন। এই জাতিধ্বংসী পরিবর্তনের স্রোত কেউই ঠেকাতে পারছে না। যদিও পরিবর্তনের অনেকগুলি ধাপ বাঙালীকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে কিন্তু কোনও পরিবর্তনই সুখকর হয়নি। কারণ, ১৯০৫ সাল থেকে বাংলার মাটি ভাগাভাগি ও যোগবিয়োগের যে কুচক্র ও শয়তানি খেলা অশুভ শক্তিগুলি করে আসছিল, তার শোকাবহ পরিণতি ঘটে ১৯৪৭ সালে। বাংলার উৎকৃষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ হাতছাড়া হয়ে নিকৃষ্ট এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে চলছে শিয়াল-শকুনের খেয়োখেয়ি। শিয়ালও বলছে আমাদের ভালো করবে, শকুনও বলছে আমাদের ভালো করবে। আর জনগণ ভাবছে—অনেক ভালো করেছ আর ভালোতে কাজ নাই; ভালয় ভালয় বিদায় দে : আলোয় আলোয় চলে যাই। কিন্তু শিয়াল-শকুনরা মুখের খাবার কি কখনও ছাড়ে। একজন ছাড়ে তো আরেকজন ধরে। মুখ পরিবর্তন করে মাত্র। তাকেই আমরা পরিবর্তন মনে করে আনন্দে পাছা চাপড়াই।

পরিবর্তন তো নতুন কিছু নয়; ইতিপূর্বেই একাধিকবার পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৪৭ এরপর ৬০-এর দশকে একবার এলোমেলো পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৭২ সালে বেশ নাড়া দিয়ে সাড়া জাগিয়ে একবার পরিবর্তন হয়েছে। পাঁচ বছর না যেতে ১৯৭৭ সালে ঘটে গেছে আমূল পরিবর্তন। কারণ ১৯৭২ সালের অনেক আশা জাগানো পরিবর্তনকে সুস্থ ও সুষ্ঠুভাবে কাজে না লাগিয়ে তাকে নস্যাৎ করে দেওয়াতেই মানুষ ৭২-৭৭-এর পরিবর্তনকারীদের ছুঁড়ে ফেলে ১৯৭৭-এর পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু বহু প্রত্যাশিত সে পরিবর্তনের ধারাকে দীর্ঘ ৩৪ বছর সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও গোষ্ঠীতন্ত্রের গহ্বরে আবদ্ধ রেখে পরিবর্তনের সুফল জনগণের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেবার উদারতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। তারই পরিণতি ২০১১ সালের সর্বশেষ পরিবর্তন। বাঙালীর জীবনে এই পরিবর্তন প্রীতি কিন্তু শুভদায়ক হয়নি। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তারা দলবদ্ধভাবে কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ত্বরান্বিত করেছিল। সে সময়ে যদি হিন্দু মহাসভাকেও ক্ষমতার অংশীদার করে নিতো, তাহলে মুসলীম লীগের কাছে হিন্দুদের অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হোত না। পরবর্তী ধাপগুলিতেও হয় কংগ্রেসকে নয় সিপিএম-কে একচ্ছত্র ক্ষমতা দখলের জন্য ভোট দিয়েছে, কখনও দুটি দলকে উনিশে-বিশে ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত করেনি। সর্বশেষ ভোটে যে পরিবর্তন ঘটছে তার পরিণতি আরও ভয়াবহ। এবারে ভোটপর্বে তৃতীয় বিকল্প বিজেপি থাকা সত্ত্বেও সিপিএমকে উচ্ছেদ করে তৃণমূল কংগ্রেসকেই বস্তা ভরে ভোট দিয়েছে— এবং ১৯৪৬-এর পর রাইটার্স বিল্ডিংস-এ মুসলমানদের দাপট দেখাবার পথ পরিষ্কার করেছে। এই কি পরিবর্তন?

এবারে ভোটপর্বে তৃতীয় বিকল্প বিজেপি থাকা সত্ত্বেও সিপিএমকে উচ্ছেদ করে তৃণমূল কংগ্রেসকেই বস্তা ভরে ভোট দিয়েছে— এবং ১৯৪৬-এর পর রাইটার্স বিল্ডিংস-এ মুসলমানদের দাপট দেখাবার পথ পরিষ্কার করেছে। এই কি পরিবর্তন?

অতিথি কলম

ফতোয়ার নামে বজ্জাতি

মুজফফর হোসেন

তিউনিসিয়া থেকে মিশর আর লিবিয়া থেকে বাহরিন পর্যন্ত মুসলিম দেশের মুসলিম শাসকরা সে দেশের জনগণের কোপে পড়েছেন। জনতা-জনার্দন সংশ্লিষ্ট শাসকদের বিলাসবহুল জীবনযাপন এবং একনায়কতান্ত্রিক শাসনে চূড়ান্ত বীতশ্রদ্ধ। তবে ওরা বিদায় নিলে যে খুব দারুণ একটা স্বচ্ছ প্রশাসন পাওয়া যাবেই তার কোনও গ্যারান্টি নেই। কিন্তু তাঁর একটা সোনালি ভবিষ্যতের আশায় তাদের বর্তমান পরিবার প্রতিষ্ঠা সাংসারিক জীবনকে বাজি রেখে নেমে পড়েছেন। পৃথিবী জুড়েই মুসলমান দেশগুলোতে এক নতুন উন্মাদনা দেখা দিয়েছে যাকে পরিবর্তনের দ্যোতক বলা যেতে পারে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখন আমজনতা অনেক কিছু জেনে গেছেন। ধর্মমত আর রাজনীতির দোহাই দিয়ে তাদের আর বেশিদিন বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না। মুসলমান দেশগুলোর দুর্ভাগ্য হলো, ওদেশে ধর্ম ও রাজনীতি একাকার—আলাদা নয়। ইসলামী ব্যবস্থায় একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কিন্তু বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণীয় নয়। রাজনীতি ও ধর্মকে একসঙ্গে মিলিয়ে নিলেই অনেকরকম সমস্যার উদ্ভব হয়। ধর্মমত যাকে ঠিক বলে মনে করে রাজনীতিও তাকে মান্যতা দেবে—এটার দরকার নেই। এজন্যই দুই-এর মধ্যে সঙ্ঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

যে সকল ইসালামী দেশ শরিয়তী আইন প্রচলন করেনি সেখানে তাদের নিজস্ব সংসদে গৃহীত সংবিধান মোতাবেক দেশের শাসনব্যবস্থা চলে। এক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় উঠে আসে যার ব্যাখ্যা দিতে হয় ধর্মমতের ভিত্তিতে। এরকম পরিস্থিতিতে মুসলমান নাগরিকদের 'দারুল উফতা' অথবা 'দারুল ফতয়া'-র মতো সংস্থা থেকে নির্দেশ নিয়ে রাস্তা বের করতে হয়। ইসলামি ধর্মমতে 'ফতোয়া' ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই হলো যাতে কেউ বিপথগামী না হয়। যদি কোনও পণ্ডিত ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন মৌলানা ফতোয়া দেন—তাহলে সব ঠিকঠাক থাকে। কিন্তু এই ভেজালের যুগে তথাকথিত কোনও মৌলানা নিজস্ব বক্তব্যকে যখন 'ফতোয়া' বলে চালিয়ে দেন তখনই যতরকম গোলমাল দেখা দেয়। ভারত এবং পাকিস্তানের সর্বসাধারণ মুসলমান সমাজ এই অযোগ্য মৌলানাদের ফতোয়ার চোটে বেশ অস্বস্তিতে পড়েন। আরও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হলো এই মাতব্বর মৌলানাদের বালখিল্যতার 'বলি' হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েরাই। ওরা এমনভাবে 'ফতোয়া' বলে স্বরচিত কালাকানুন লাগু করেন যে, মুসলমান মহিলাদের স্বাধীনতা এবং আত্মসম্মান—দুটোই বিপদগ্রস্ত হয়। তবে সমাজে ইন্সটিটিউট অব্ ইসলামিক স্টাডিজের মতো সংস্থাও রয়েছে—যারা এরকম সময়ে যথাযথ মার্গদর্শন করে থাকে।

বিচিত্র ফতোয়া :

সম্প্রতি দুটি বিচিত্র ধরনের ফতোয়া জারি করা হয়েছে। একটি ফতোয়ায় বলা হয়েছে—কোনও মুসলমান মহিলা পুরুষ সঙ্গী ছাড়া ৪৮ কিলোমিটারের বেশি ভ্রমণ বা যাতায়াত করতে পারবে না। দ্বিতীয়টিতে—যেখানে মহিলারা কাজ করবে সেখানে বোরখা পরতে হবে। দুটো ফতোয়াই আধুনিক যুগে মুসলমান মহিলাদের একরকম পিছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ মহিলা এই ফতোয়াকে স্বীকার করতে এগিয়ে আসবেন— এই প্রশ্ন উঠছে। ইসলামি শরিয়তে মেয়েদেরকে তাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে আত্মীয়দের সঙ্গে যাতায়াতের কথা বলেছে। কিন্তু এখনকার দিনে এটা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা কতটা কঠিন সেকথা আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। যেসব মেয়ে বাইরে চাকরি করেন বা কাজ করেন তাঁরা ওই দুটোই মেনে নিতে পারবেন না। বর্তমানের জেটের যুগে, কনকর্ডের যুগে ৪৮ কিলোমিটারের মতো সামান্য দূরত্বের কতটুকু গুরুত্ব বেশি ভ্রমণ বা যাতায়াত করতে পারবে না। দ্বিতীয়টিতে—যেখানে মহিলারা কাজ করবে সেখানে বোরখা পরতে হবে। দুটো ফতোয়াই আধুনিক যুগে মুসলমান মহিলাদের একরকম পিছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ মহিলা এই ফতোয়াকে স্বীকার করতে এগিয়ে আসবেন— এই প্রশ্ন উঠছে। ইসলামি শরিয়তে মেয়েদেরকে তাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে আত্মীয়দের সঙ্গে যাতায়াতের কথা বলেছে। কিন্তু এখনকার দিনে এটা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা কতটা কঠিন সেকথা আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। যেসব মেয়ে বাইরে চাকরি করেন বা কাজ করেন তাঁরা ওই দুটোই মেনে নিতে পারবেন না। বর্তমানের জেটের যুগে, কনকর্ডের যুগে ৪৮ কিলোমিটারের মতো সামান্য দূরত্বের কতটুকু গুরুত্ব

সম্প্রতি দুটি বিচিত্র ধরনের ফতোয়া জারি করা হয়েছে। একটি ফতোয়ায় বলা হয়েছে—কোনও মুসলমান মহিলা পুরুষ সঙ্গী ছাড়া ৪৮ কিলোমিটারের বেশি ভ্রমণ বা যাতায়াত করতে পারবে না। দ্বিতীয়টিতে—যেখানে মহিলারা কাজ করবে সেখানে বোরখা পরতে হবে। দুটো ফতোয়াই আধুনিক যুগে মুসলমান মহিলাদের একরকম পিছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ মহিলা এই ফতোয়াকে স্বীকার করতে এগিয়ে আসবেন— এই প্রশ্ন উঠছে।

আছে? যদি কোনও মুসলমান রাষ্ট্র আকাশে কোনও নিজস্ব উপগ্রহ-যান পাঠায় তাহলে সেখানে অবশ্যই কোনও মহিলা থাকবে না। তাহলে কোনও মুসলিম রাষ্ট্র সে দেশের মহিলাদের উন্নতি বা প্রগতির পথে এগোনোর আদেশ দেবে না। হজযাত্রাই তো কতো লম্বা সফর। প্রায় ৪০ দিন লাগে সম্পূর্ণ হতে। এক্ষেত্রে কোনও মহিলা তো একা কখনও হজে যেতে পারবেন না। যেতে হলে একজন পুরুষ সহযাত্রী নিতে হবে। মানে ডবল খরচ। উপরিউক্ত ফতোয়ার ফলে কি মহিলাদের হজের মতো পবিত্র কাজের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে না? একটাকে ইসলাম-বিরোধী বলা হবে না কেন?

বোরখা'র বেড়াজাল :

কাজ করার সময়েও বোরখা পরাটা আবশ্যিক করা হয়েছে। এসময়ে এমন অনেক কাজই রয়েছে যা বোরখা পরে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বোরখা পরা অবস্থায় কাজ কতটা অসুবিধাজনক এটা কল্পনা করা কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। একজন সাধারণ মহিলা, যাকে উদরপূর্তি ও ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্যে ঘরের বাইরে কাজে বেরোতে হয় তাদের উপরে ওইরকম ফতোয়া জারি করা হচ্ছে। ঘরে থাকলে দুবেলা উদরান্ন জুটবে না—তাদের জন্য ওই ফতোয়া কতটা যুক্তিযুক্ত? অস্যার্থ মেয়েরা সার্বজনিক ক্ষেত্রে গিয়ে কোনও কাজই করতে পারবে না। মেয়েরা বড় খেলোয়াড় হতে পারবে না, উচ্চশিক্ষা নিয়ে বোরখা ছাড়া বিদেশে গিয়ে নিজের যোগ্যতা তুলে ধরতে পারবে না।

যাঁরা এরকম ফতোয়া দিচ্ছেন, তাঁরা আগে বলুন তাঁদের কাছে বোরখার অর্থ কি? মুসলিম দেশে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বোরখা পরতে দেখা যায়। কেউ বোরখার পরিবর্তে গাউনকেই পর্দার মতো ব্যবহার করতে পারে। পর্দার অনেক রূপভেদ আছে। প্রত্যেক দেশে এবং সমাজে নিজ নিজ পার্থক্য রয়েছে। ফ্রান্সে বোরখা নিষিদ্ধ করে আইন পাস হয়েছে। কোনও মহিলাকে সার্বজনিক স্থানে বোরখা পরা অবস্থায় দেখা গেলে জরিমানা দিতে হবে। এই ফতোয়া মানতে হলে তো মুসলিম মেয়েদেরকে কাম-কাজ, ঘর-বাড়ি ছেড়ে ফ্রান্স থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে। এটা কীরকম ফতোয়া যে মহিলারা ঘরে বসে অভুক্ত থাকবে অথবা যে দেশে কাজ করে সপরিবার বসবাস করছিল সেখান ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হবে! যদি কেউ ফ্রান্সের নাগরিকত্ব নেন তাঁকে হলফনামা দিতে হবে আর কোন্ দেশ তাঁকে বা তাঁদের নাগরিকত্ব দিচ্ছে। দুটো ফতোয়াই ব্যবহারিকভাবে অবাস্তব।

নির্লজ্জতার চূড়ান্ত :

যদিও পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে ইসলামের নামে, তা সত্ত্বেও বলা যায় পাকিস্তানই ইসলাম-কে সর্বাধিক বদনাম করেছে। এতটা অন্য কেউ করেনি। ওখানে কখনও তালিবান'কেই ইসলামের প্রতিমূর্তি বলে চালানো হয়, আবার যা খুশী ফতোয়া যখন তখন দেওয়া হয় ইসলামের নামে। এখন তো মহিলাদের পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও ফতোয়া জারি চলছে। কেউ যদি একথা বিশ্বাস না করেন তাহলে তাঁকে দিল্লী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'নয়ী দুনিয়া'-র ২৮ মার্চের সংস্করণটা দেখতে অনুরোধ করব। সংবাদের শীর্ষকই হলো—''মহিলাদের ব্রা'র উপর পাকিস্তানী ফতোয়া'। ওখানে খবরের মধ্যে লাহোর থেকে প্রকাশিত একটি খবর উদ্ধৃত করা হয়েছে। এটাকে সবাই চাটনির মতো তারিয়ে তারিয়ে পড়ছে। সম্প্রতি এই পত্রিকাটিই একটি মন্তব্যকে 'ফতোয়া'-র মতো করেই প্রকাশ করেছে। পত্রিকাটি নির্লজ্জতার সব সীমা পার করে এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে যাকে সভ্য সমাজে মেনে নেওয়া যায় না।

এই যে, কোনওরকম স্তরেই আসে না এমন খবরের জন্যে মুফতি আতাউল্লা পাকিস্তানের অনেক মুফতির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন যাঁরা যখন তখন ফতোয়া জারি করে থাকেন। মাদ্রাসাতেও খোঁজ-খবর নিয়েছেন। কিন্তু কেউই ওঁর প্রতি সহমত পোষণ করেননি বা সম্মতি দেননি। মুফতি আতাউল্লা আবার বড় গলা করে বলেছেন, ''এরকম খবরকে সম্প্রচার করে বৈদ্যুতিন-মাধ্যমগুলো মানুষের সেন্টিমেন্টকে উসকে দিচ্ছে। পাকিস্তানী মিডিয়া আর ধর্মীয় সংবাদপত্রগুলোর নজর না দেওয়াতেই এমন খবর জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।'' অথচ বাস্তব পরিস্থিতিই হলো, ইসলামি দেশে এমন কোনও ব্যবস্থা নেই যে এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলার উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মুসলমান সমাজ নিজেদের সমাজ সভ্যতা নিয়ে বড়াই করলেও ধর্মের নামের আড়ালে নিজ সমাজকেই অপমানের কাঠগড়ায় তুলতে পিছপা হয় না।

ইসলামের নামে জয়ঢাক পেটানো পাকিস্তানের মৌলানারা এবং সরকার ওইসকল 'নর্দমা-ছাপ' সংবাদপত্রের (নিম্নশ্রেণীর) বিরুদ্ধে কেন কোনও ব্যবস্থা নেয় না? 'কাফের আইন'-এর দোহাই দিয়ে যে কাউকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে, তাহলে ওরকম নিম্নরুচির সংবাদ পরিবেশকদের কাজকর্ম 'ইসলাম'-কেই যখন বদনাম করছে—সেখানে চুপ কেন?

ইসলাম-নিন্দার অজুহাতে যে কোনও সময় খৃস্টান, হিন্দু এবং আহমদিয়া সম্প্রদায়ভুক্তদের গলায় ফাঁসির দড়ি লটকানোর ব্যবস্থা হয়ে যায়। তাহলে ওরকম নিম্নরুচির খবর পরিবেশনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না কেন? ছোট ছোট ঘটনাতেই স্লোগান তোলা হয়—'ইসলাম খতরে মেঁ হ্যায়।' ওইসব অপমানকর ফতোয়া জারি করাতে কি ইসলামী ব্যবস্থায় কালির দাগ লাগে না?

অ-ইসলামিক দেশই তাহলে ভালো --- অন্ততঃপক্ষে সভ্যতার নামে নিজের লোকেদের উপর কালিমা লেপন করে না।

অস্ট্রেলিয়ায় মন্দিরে আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্ শহরে সবচেয়ে পুরাতন হিন্দু ধর্মীয় উপাসনাস্থল 'শ্রীমন্দিরে' আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে গত ১৯ মার্চ। ফলে ভারতবর্ষ এবং বহির্ভারতে হিন্দুদের মধ্যে তীব্র আক্রোশের সঞ্চার হয়েছে। এটাই কিন্তু প্রথম ঘটনা নয়। বিগত কয়েক বছরে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠরত অথবা বসবাসরত হিন্দুদের উপর একাধিক আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। অসভ্য অস্ট্রেলিয়ানরা মন্দিরে পচা ডিমও ছুঁড়েছিল। ভাঙচুর করেছিল। ১৯ মার্চ প্রার্থনা কক্ষের সামনের রাস্তা থেকে দুজন দুষ্কৃতী বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। বরাতজোরে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তখন ওখানে কেউ ছিল না। ১৯৭৭ সালে নির্মিত এই মন্দিরের চারপাশে ঘন মুসলিম জনবসতি রয়েছে। বিগত কয়েক বছরে মন্দিরের সামনে গাড়ী পার্ক করাকে কেন্দ্র করে বচসা লেগেই আছে।

স্বাভাবিকভাবেই ওখানকার হিন্দুরা গুলিচালনাকারীদের সত্বর গ্রেপ্তারের দাবী জানিয়েছে। সিডনী থেকে প্রকাশিত 'দ্য ইন্ডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদক রোহিত বেরোর কথায় এই গুলিচালনা কোনও হঠকারী বা বালখিল্যদের কাজ নয়। এদের গূঢ় উদ্দেশ্য হলো, ভক্তদের মন্দির থেকে দূরে রাখা। এজন্য একটা ভয়ের আবহ তৈরি করা। মন্দিরের পুরোহিত যতীন কুমার ভট্ট তিন পুত্র-কন্যা নিয়ে সপরিবারে মন্দিরেই বসবাস করেন। ছোট ছেলেমেয়েরা গুলিবর্ষণে দারুণ আতঙ্কিত হয়েছে। মন্দিরের দেওয়ালে রোজই বাজি ফাটানো হয়। গুলিবর্ষণের কিছুক্ষণ পরে পুলিশ এসে পৌঁছায়। তারাও মন্দিরের দেওয়ালে গুলির দাগ দেখে বিস্মিত। গত বছরের নভেম্বর মাসে মন্দিরের প্রার্থনা কক্ষের লোহার বেড়ার ক্ষতি করেছিল দুষ্কৃতীরা। ওই ভাঙচুরের সময় অনেক ভক্ত মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ বলছে, তারা দুষ্কৃতীদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে।

স্থানীয় লেবার পার্টির সাংসদ গৈরো বারবার হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে ঘটনার কঠোর নিন্দা করেছেন।

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রী-শিক্ষিকার সম্পর্কে সহনশীলতা প্রয়োজন

মিতা রায়

আমাদের ভারতের ইতিহাসে গুরুকুল প্রথায় গুরুর কাছে থেকে ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার পাঠ নেওয়ার রীতি ছিল। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে একটা সুস্থ সম্পর্ক এবং শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের বা শিষ্যের থাকত নিগূঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি। এটা চিরকালীন সত্য যে, শিক্ষা মানুষকে স্বাধীন করে, বুদ্ধি শাণিত করে। বিনয় দান করে। তাই, শিক্ষাঙ্গনগুলোতে প্রয়োজন শিক্ষাগুরু ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা সহনশীল, সহমর্মী সম্পর্ক।

কিন্তু ইদানিংকালে শিক্ষায়তনগুলোতে দেখা যাচ্ছে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে একটা বিরক্তিমূলক হিংসাত্মক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেশ কিছুদিন ধরে দৈনিক কাগজে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, শিক্ষিকার মারে ছাত্র বা ছাত্রী আহত বা মানসিক নিপীড়ন চলছে তাদের প্রতি। এ হেন ঘটনা কখনই সুখকর তো নয়ই; বাঞ্ছিত নয়। কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা স্বভাবসুলভ ভাবেই চঞ্চল, একগুঁয়ে। সেক্ষেত্রে তাদের বে-নিয়মে শিক্ষিকারা তাদের বকবেন, বোঝাবেন, কিন্তু গায়ে হাত তুলে শাসন করার অধিকার কখনই তাঁদের নেই। সেই অধিকার থাকতে পারে একমাত্র অভিভাবকদের। অনেক আগে স্কুলের শিক্ষিকাদের সম্পর্কে একটা ধারণা থাকত যে, স্কুলের দিদিমণি মানে রাগী ও গম্ভীর। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এ হেন ধারণার ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকত একটা কোমল মন। বাইরে কঠোর হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাঁদের মনপ্রাণ সঁপে দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাদের কিসে ভাল হবে, তার জন্য সর্বদাই দু' হাত বাড়িয়ে দিতেন। তখনকার শিক্ষকদের বেতন ছিল খুবই সামান্য। ফলে আর্থিক অবস্থা ভাল হোত না। কিন্তু একটা নীতি একটা আদর্শ নিয়ে তারা চলতেন। (শিক্ষিকারা প্রকৃতপক্ষে মায়ের জাত। মাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে সন্তানসম ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে টেনে নেওয়াই তাঁদের ধর্ম। জীবনের শিক্ষার প্রথম ধাপ গড়ে ওঠে বিদ্যালয়স্তরে। সেই দায়িত্ব পালন করার কথা শিক্ষয়িত্রীর)।

যতদিন যচ্ছে আধুনিকমনস্ক হচ্ছে মানুষ। ততই উচ্চশিক্ষিত বা শিক্ষিতদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সহনশীলতার অভাব, সহমর্মিতার অভাব আর ধৈর্যের অভাব। কিন্তু এমনটা একবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে কখনওই ভাবা যায় না। এখন বেশিরভাগ বিদ্যালয় সরকারি অনুমোদিত হওয়ায় রাজ্য সরকারি বেতন কমিশন হওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বেড়েছে। মূল্যবোধও বেড়েছে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে। কিন্তু এত কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা সত্ত্বেও শিক্ষক বা শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্ক ভীতিপ্রদ হয়ে পড়ছে। একটা দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। সহনশীলতার

অভাব সততই স্পষ্ট হচ্ছে। এর কারণ জানতে গিয়ে আমার পরিচিত এক মনোবিদ (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেই বসলেন—স্বার্থকেন্দ্রিক হওয়ার মানেই এ ধরনের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। আন্তরিকতার কোনও ছোঁয়া নেই শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের। আগেকার দিন, অর্থাৎ কিনা অন্তত দশক দুই আগে পর্যন্তও শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীর একটা অবিচ্ছেদ্য শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহশীল সম্পর্ক গড়ে উঠত। পরস্পর পরস্পরের প্রতি একটা টান অনুভব করত। কৃতজ্ঞতা বজায় থাকত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। শিক্ষক-শিক্ষিকার বিপদে-আপদে সকলের মতো তারা এগিয়ে আসত সহজেই। কিন্তু এখনকার দিনে বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে যতক্ষণ, ততক্ষণই গুরুদের মান্য করা; তবে তার বাইরে নয়। এই পরিস্থিতি কখনওই সমীচীন নয়। অথচ দিনের পর দিন এটাই ঘটছে বেশি। শিক্ষাক্ষেত্রে ইদানিং শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সম্পর্কটাই বেশি। যে ছাত্রী যে স্কুল শিক্ষিকার কাছে বেশি টাকা দিয়ে পড়বে, তার ওপর নজর বেশি, অন্যদের ওপর নয়। সেই নজরে মিশে আছে স্বার্থ। গুরুজনদের সম্মান দিতে শিখছে না বর্তমান প্রজন্ম; তাই তারা হয়ে উঠছে উদ্ধত। এ ব্যাপারে প্রবীণ প্রাক্তন শিক্ষিকা শ্যামলী মিত্রর বক্তব্য হলো, আজকের দিনে পারিবারিক ন্যূনতম যে শিক্ষা তা পাচ্ছে না তারা। ফলে কোনটা উচিত কোনটা উচিত নয়; এরা শিখতে জানে না। তাই নত হওয়া বা মান্য করা না শিখে উদ্ধতভাব তাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। আমিও একদিন শিক্ষিকা ছিলাম, ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যায় দেখে শাসন করেছি; শাস্তিও দিয়েছি, কিন্তু তা কখনই গায়ে হাত তুলে নয়, ভাল কথায় বুঝিয়ে। হিংসাত্মক মনোভাব দিয়ে কখনও সুশিক্ষা দেওয়া যায় না।

সর্বত্রই আজ হিংসা, ঈর্ষার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত, বিদ্যালয়ে যেখানে শিশুরা জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে, সেখানে তাদের প্রতি এই মনোভাব কখনই কাম্য নয়। তাই, আজকের দিনে এই শপথ গ্রহণ করা প্রয়োজন যে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সংবেদনশীল, সহমর্মী সম্পর্ক গড়ে উঠুক, হিংসা নয়। ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা বজায় থাকুক।

হাউটনের বিদায় কেন নয় ভারতীয় কোচ?

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই প্রতিবেদন লেখার সময় ভারতীয় ফুটবল দলে কোনও কোচের নিয়োগ হয়নি। তবে ভারতীয় কোচের প্রত্যাশা করা যেতেই পারে। সাড়ে চার বছরের বব হাউটন জমানা শেষ হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সঙ্গে এ আই এফ এফের বড় কর্তাদের বাকবিতণ্ডা চলছিল। কাতারে এ এফ সি কাপে ভারতের শোচনীয় ব্যর্থতার পরও তাঁর বাগাড়ম্বর বন্ধ হয়নি। ক্রমান্বয়ে সমালোচনা করে গেছেন ফেডারেশন কর্তা থেকে এদেশের ফুটবল সিস্টেম ও পরিকাঠামোর। তাছাড়া রেফারি দীনেশ নায়ারের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যমূলক মন্তব্য করে নিজের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়েছেন বৃটিশ কোচ। ২০০৭, ০৮, ০৯ তিন বছর তিনটি মাঝারি মানের টুর্নামেন্টে ভারতকে চাম্পিয়ন করিয়েও পরবর্তীকালে তাঁর কিছু তুঘলকী আচার-আচরণ বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল ফুটবল কর্তাদের। মিডিয়া ও প্রাক্তন ফুটবলার কাম কোচেরাও তাঁর বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছিল ক্রমাগত পত্র পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলে। এ সবকিছুই প্রভাবিত করেছে প্রফুল্ল প্যাটেল, সুনন্দ ধরদের।

গত চার বছরে সাপোর্ট স্টাফ যাঁদের নিয়ে কাজ করেছেন হাউটন, তাঁরা প্রত্যেকেই এক একজন অপদার্থ। হাউটন মাথার ওপরে থাকায় তাঁরা অযোগ্য, অপদার্থ হয়েও নানাধরনের সুযোগ সুবিধে ভোগ করেছেন। ফিজিক্যাল ট্রেনার হিসেবে যে গোয়ানিজ ভদ্রলোক এতদিন ধরে যুক্ত ছিলেন জাতীয় দলের সঙ্গে তাঁর ভূমিকা নিয়ে মিডিয়া কেন হৈচৈ করছে না সেটাই বোধগম্য হচ্ছে না এই প্রতিবেদকের। সবাই কাঁটাছেঁড়া করছে হাউটনের কাজকর্ম। সব দোষ কি হাউটনের? ফিজিও সুরেশবাবু, যাঁর কলকাতার কোনও তৃতীয় ডিভিশন ক্লাবেই কাজ জুটবে না, তিনি কিনা জাতীয় দলের সঙ্গে নির্লজ্জের মতো ঘুরে বেড়ালেন। খেলোয়াড়দের ফিট রাখার বদলে আরো চোটগ্রস্ত করে দেয় তাঁর ট্রেনিং। হাতের কাছে এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে তাঁর কীর্তিকলাপ বোঝানোর জন্য।

জাতীয় দলের ম্যানেজার করা হয়েছিল একজন প্রকৃত বিচক্ষণ ব্যক্তিকে। প্রদীপ চৌধুরী অতীতের কীর্তিমান খেলোয়াড়। ভারতের অধিনায়কত্ব করেছেন দেশে-বিদেশে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার উচ্চপদস্থকর্মী প্রদীপ দিনের পর দিন নিজের অনেক ক্ষতি স্বীকার করে দেশের হয়ে সার্ভিস দিয়ে এসেছেন। সেই সুভদ্র, শিক্ষিত প্রদীপকেই কিনা কয়েকজন খেলোয়াড় হাউটনের পরামর্শে দল থেকে সরে যেতে বাধ্য করল। আর এমন সময়ে যখন তাঁর মতো সুদক্ষ ম্যানেজারকেই দরকার ছিল। কাতারে এ এফ সি কাপের চূড়ান্ত পর্বের খেলার ঠিক আগে দুবাইয়ে

প্রস্তুতি শিবিরেই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে বাইচুঙ, সুনীল ছেত্রীরা। যাকে মদত দিয়ে গেছেন স্বয়ং হাউটন। ফলে প্রদীপকে আত্মসম্মান নিয়ে ফিরে আসতে হয়, পরিবর্তে হাউটনের পেয়ারের লোক জনৈক দুবাইবাসী ব্যবসায়ী—যাঁর ন্যূনতম টেকনিকাল জ্ঞান নেই তিনিই ম্যানেজার হয়ে যান।

ভারতীয় দল নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলার জন্য হাউটনের অপসারণ প্রত্যাশিতই ছিল। ফেডারেশন তাঁকে শোকজ করে। তারপর টেকনিকাল ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের চাপে তাঁকে অপসারণ করে। এবার কি কোনও ভারতীয় কোচের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে? ফেডারেশনের অন্দরমহলের খবর অনুযায়ী আবার হয়ত বিদেশী কোচকেই নিয়ে আসা হবে। বেশ কয়েকজন বিদেশী কোচের বায়োডেটা জমা পড়েছে দিল্লির ফুটবল হাউসে। এঁদের মধ্যে যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন বিচারে কাউকে হয়ত কোচ করা হবে। তারপর সেই খাড়া-বড়ি-থোড়, থোড়-বড়ি-খাড়া। দেশীয় ক্লাব কোচ, দেশীয় ক্লাবগুলোর সঙ্গে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া, এদেশের মাঠ থেকে প্রশাসন সব কিছুর সমালোচনা করে যাওয়া, গায়ের চামড়া সাদা বলে যা খুশি তাই করে বেড়ানোর স্বাধীনতা। সাহেবের লাথি হজম করেও তাঁর সব আবদার, বায়নাক্কা মিটিয়ে যাবে ফেডারেশন। সাহেব হয়ত বিক্ষিপ্ত সাফল্য এনে দেবে, বড় জায়গায় অবশ্য যথারীতি ছেড়ে দে মা, পালিয়ে বাঁচি অবস্থার ট্রাডিশন বজায় থাকবে। তাহলে কেন আর্মান্দো কোলাসো সুযোগ পাবেন না।

আর্মান্দো এই মুহূর্তে ভারতের সেরা কোচ। দল পরিচালনা বা ম্যান ম্যানেজমেন্ট, রণকৌশল তৈরি, পরিস্থিতি অনুযায়ী তার রদবদল করা, ফুটবলার ও কর্মকর্তাদের সমন্বয় রেখে কাজ করা—সব ক্ষেত্রেই মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ডেম্পোকে ভারতীয় ফুটবলে অন্য উচ্চতায় তুলে এনেছেন। এশিয়া পর্যায়ে ক্লাব টুর্নামেন্টে সেমি ফাইনালেও তুলেছেন। নিজে মাঝারী মানের খেলোয়াড় ছিলেন কিন্তু কোচ হিসেবে সবদিক থেকে যোগ্য। অন্য ভারতীয় কোচেদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে আছেন। সর্বভারতীয় ফুটবলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও আছে। সারা দেশের ফুটবল সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা আছে যেহেতু জাতীয় লিগে কোচিং করছেন। তারপরই নাম উঠতে পারে কলকাতার 'বাবলু'র। এক সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় অথচ বিতর্কিত ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য এখন চিরাগের কোচ। ছোট দল চিরাগকে সর্বভারতীয় আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা পাইয়ে দিয়েছেন। ডুরান্ড কাপে জেসিটিকে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করেছে সুব্রতর চিরাগ।

গত বছর জাতীয় লিগে একটা সময় পর্যন্ত শীর্ষে ছিল চিরাগ, শেষপর্যন্ত অবশ্য তা ধরে রাখতে পারেনি। সুব্রতর ফুটবল বোধ বা গেম রিডিং, ট্যাকটিক্স নির্ধারণ এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। তবে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন। কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পারেন না। খেলোয়াড়দের মধ্যেও তাঁকে নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এই দোষত্রুটি কাটিয়ে উঠতে পারলে সুব্রতও ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আর্মান্দো ও সুব্রতকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। তবে সুব্রত কি আর্মান্দোর সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারবেন, বাধা তাঁর ইগো।

‘নট এ ভাই, নট এ পাই’

বীর সাভারকরের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে, (স্বস্তিকা, ২৬.৫.০৮), শ্রী গোপীনাথ দে জানিয়েছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে গান্ধীজী ‘নট এ ভাই, নট এ পাই’-এর ডাক দিয়েছিলেন। আমি ওই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলাম (স্বস্তিকা, ৩০.৬.০৮) ওই আওয়াজটির জনক ছিল, তখনকার সি পি আই। প্রত্যুত্তরে, গোপীনাথবাবু তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও গোপীনাথবাবুর বক্তব্য আমি মেনে নিতে পারিনি। কারণ আমার কলেজ জীবনের স্মৃতি। তবে, বিষয়টি আমার ভাবনায় ছিল। তাই, 'Better late than never' বচন মান্য করে এই পত্রের অবতারণা।

‘নট এ ভাই, নট এ পাই’ আওয়াজটি যে সি পি আই তুলেছিল, শ্রী শৈলেশ দে-র সুপ্রসিদ্ধ ‘আমি সুভাষ বলছি’ গ্রন্থে সে কথার সমর্থন পাওয়া যায়। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী দে বলেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির বক্তব্য ছিল—এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আমেরিকার যুদ্ধ। সুতরাং ‘এক পাই, এক ভাই নাহি দিব সমরে’। পরে অবশ্য জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ায় দলীয় মুখপত্র ‘অরণি’, ‘জনযুদ্ধ’ ও ‘পিপলস্ ওয়ার’-এ শোনা গেল নতুন শ্লোগান—‘চাল দাও, টাকা দাও, সেনাদলে ছেলে দাও’। কারণ এ যুদ্ধ, জনযুদ্ধ—(ওই, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮ম অধ্যায়)। সি পি আই-এর ওই ‘তাত্ত্বিক’ ডিগবাজি প্রসঙ্গে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য—"The Imperial war become overnight a people-war by the magic of Communism"-('History of the Freedom Movement In India'--Vol. III)।

পরিশেষে একটি কথা। পুস্তক বা পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত তথ্য মাত্রই ধ্রুব সত্য নয়। দুটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন, এন সি দে বলেছেন—‘‘...এই জিন্নাকেই ১৯২৪ সালে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করেছিলেন সেই গান্ধী...’’—(দ্রঃ স্বস্তিকা শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা ১৪১২—পৃঃ ৪১)। প্রকৃত ঘটনা হলো, জিন্না কোনওদিনই কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি, এবং স্বয়ং গান্ধীজী ১৯২৪ সালে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। (ডঃ) নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত তাঁর পত্রে (স্বস্তিকা ৯.৮.১০) বলেছেন—‘‘১৯৫০ সালে কংগ্রেস সভাপতিপদের জন্য প্রার্থী হয়েছিলেন আচার্য কৃপালনী এবং গোবিন্দবল্লভ পন্থ/...পন্থ জয়ী হলেও...’’/তথ্যটি ভুল। পন্থজী নয়; কৃপালনীর বিরুদ্ধে দাঁড়য়েছিলেন পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন; এবং ট্যান্ডনজী জয়ী হয়েছিলেন।

২৯.১১.১০ তারিখের পত্রে রক্ষিত মহাশয় বলেছেন—‘‘ওয়ার্কিং কমিটিতে (দেশভাগের) প্রস্তাব ১৫৭/২৯ ভোটে গৃহীত হয়েছিল।’’ সঠিক তথ্য হলো, ওয়ার্কিং কমিটিতে নয়; প্রস্তাবটি ১৫৭/২৯ ভোটে গৃহীত হয়েছিল এ আই সি সি-তে। আমার ১০.১২.১০ তারিখের পত্রে ডঃ রক্ষিতের ওইসব তথ্য বিভ্রান্তির বিষয়টি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করেছিলাম, স্বস্তিকা-র পাঠককুল কী এতই হেলাফেলার পাত্র যে যা খুশি একটা লিখে দিলেই হলো? পত্রটি প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

—বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০।

পরিবর্তন

পরিবর্তন, পরিবর্তন, পরিবর্তন—জগৎজুড়ে পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে সমাজের বুকে। কিন্তু মানুষ পরিবর্তন সম্পর্কেও দিশাহীনভাবে ছুটে চলেছে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। কোনও পরিবর্তনেই খুঁজে পাচ্ছে না আত্মিক, মানসিক শান্তি। কেউ চাইছে আর্থিক পরিবর্তন, কেউ সামাজিক, কেউ বা চাইছে রাজনৈতিক পরিবর্তন। এই ধরনের পরিবর্তনগুলি একের পর এক ঘটার পর আবার দেখা দেয় অশান্তির কুজ্ঝটিকা। স্বামীজী বলেছেন— (Change is the life) ‘‘পরিবর্তনই জীবন’’। স্বামীজী কোন্ পরিবর্তনের কথা বলেছেন? স্বামীজী সেই পরিবর্তনের কথা বলেছেন, যার মাধ্যমে দ্বিপদযুক্ত, স্তন্যপায়ী জীব থেকে মানুষ, মানুষ থেকে মনুষ্যত্বে বিকাশ, মনুষ্যত্ব থেকে মহামানবের বিকাশ, মহামানব থেকে দেবত্বে পরিবর্তন হতে পারে। সেই মাধ্যমটা কী? সেই মাধ্যম হলো—ভারত তথা পৃথিবীর রক্ষাকবচ ভারতের আধ্যাত্মিকতা তথা হিন্দু চিন্তারা। হিন্দু জীবনধারায় চার পুরুষার্থের প্রথমেই ধর্ম ও তারপর অর্থ ও কাম এবং শেষে মোক্ষ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। এই আধ্যাত্মিকতা তথা হিন্দু চিন্তন শেখায় Simple living high thinking অর্থাৎ সাধারণ জীবনযাপন ও উচ্চ চিন্তন। আর এই ধরনের মহামানবই দিতে পারে আত্মিক সুখ ও মানসিক শান্তি। আজ সর্বত্র ভোগপিপাসু দ্বিপদযুক্ত জীবেরা সমাজে কর্তৃত্ব করার জন্য পরিবর্তনের ডঙ্কা বাজিয়ে অন্যায়ভাবে আর্তনাদ করে চলেছে চতুর্দিকে। প্রত্যেকের কণ্ঠেই পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি। আর যারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তারা বেশীর ভাগই খুন, রাহাজানি, ও ভোগলালসায় নিমজ্জমান। আর যারা সত্যিকারের পরিবর্তন করতে চাইছে দীর্ঘ ৮৬ বছর ধরে, নীরবে নিভৃতে, আধ্যাত্মিক কর্মযোগের মাধ্যমে, তাদের নেই প্রচার প্রসার, নেই আর্তনাদ, আর এটাই বুঝি হয়। কারণ খালি কলসীর আওয়াজ একটু বেশিই হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও তার বিবিধ ক্ষেত্র, মঠ-মন্দির, সাধুসন্ত সমাজই পারে সত্যিকারের পরিবর্তনের ধারা বয়ে আনতে। তাই রাজনৈতিক পরিবর্তনই শেষ কথা নয়। মনুষ্যজীবনের নৈতিক ও চারিত্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের বা জাতির পরিবর্তন আসতে পারে। তাই পৃথিবীর সার্বিক মঙ্গলের জন্য সকল মানুষকে একই কণ্ঠে উচ্চারিত করতে হবে হিন্দু চিন্তনের সেই বৈদিক মন্ত্র—‘‘সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তুঃ নিরাময়াঃ, সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগভবেৎ’’।

—শুভেন্দু সরকার, ধূলাগড়ী, হাওড়া।

জননীর জঠরের লজ্জা

খবরে প্রকাশ রাজনৈতিক লড়াইয়ে হেরে গিয়ে এবার বিরোধী এবং পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয়নেত্রী তথা রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অত্যন্ত অশালীন ভাষায় আক্রমণ করলেন সিপিএমের বিতর্কিত নেতা অনিল বসু। ২২ এপ্রিল শুক্রবার আরামবাগে এক প্রকাশ্য জনসভায় তিনি মমতাকে সোনাগাছির মেয়ে বলে উল্লেখ করেন। সাবাস অনিল বসু, সাবাস। আপনি কি সুন্দরভাবে একজন ভদ্রমহিলার চরিত্র অঙ্কন করেছেন। বোধকরি আপনি শুনতে পাচ্ছেন, আপনার ওই মন্তব্যের জেরে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের শহরসহ গ্রামগঞ্জের আনাচে কানাচে বলাবলি হচ্ছে যে—কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া এত সুন্দরভাবে কেউ কারও চরিত্র অঙ্কন করতে পারেন না। এটা এখন ন্যূনতম সম্মানবোধ যাদের আছে তাদের কথা। তবে আপনার মতের মতাবলম্বী যারা তারা অবশ্যই আপনার বক্তব্য শুনে হাততালি দিয়েছে। এর আগে আপনি একবার মমতার চুলের মুঠি ধরে কালীঘাটে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাই না?

অনিলবাবু এবার আপনি এবং আপনার মত সিপিএম দলের কিছু মহান ব্যক্তিত্ব এবং সম্পদদের গুণকীর্তন করা যাক যা পড়ে বাংলার জনগণ আরও ভাল করে আপনাদের চিনবেন।

১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ। বেলা সাড়ে দশটা থেকে বেলা সাড়ে এগারোটার মধ্যে বর্ধমান শহরের তেলমারুই রোডে সাঁই পরিবারের বাড়িতে এক নৃশংস ঘটনা ঘটে। সাঁইভায়েরা বর্ধমান শহরে কংগ্রেস ''অ্যাকটিভিস্ট'' বলে পরিচিত। ওইদিন সাঁইবাড়ির কন্যা স্বর্ণলতাদেবীর পুত্রসন্তানের মাত্র একমাস বয়স। পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী স্বর্ণলতাদেবী সেদিন আঁতুড় ঘর থেকে বেরোবেন। বর্ধমানের সাঁইবাড়িতে তাই সেদিন আনন্দের পরিবেশ। স্বর্ণলতাদেবীর পাঁচভাই—নব সাঁই, বিজয় সাঁই, প্রণব সাঁই, মলয় সাঁই এবং উদয় সাঁই। প্রত্যেকেই এমন শুভদিনে বাড়িতে একটু আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করতে ব্যস্ত। বাড়ির গৃহশিক্ষক জিতেন রায়ও সেদিন ওই বাড়িতে উপস্থিত। বাড়ির বড় ছেলে নব সাঁই বাজারে গিয়েছেন মাংস কিনতে। বাকিরা সবাই বাড়িতে রয়েছেন। এমন সময় বিনয় কোঙার, খোকন সেন, অমল হালদার, মানিক রায়, রজত ব্যানার্জি প্রমুখের নেতৃত্বে সিপিআই(এম) সমর্থকদের জনা পনেরো চিৎকার করতে করতে সাঁইদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

মারমুখী ও সশস্ত্র সিপিআই(এম) সমর্থকদের দেখে বিজয় সাঁই বাড়ির পিছনে লুকিয়ে পড়েন। সিপিএম সমর্থকরা বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই শাবল, টাঙি এবং সড়কি দিয়ে কুপিয়ে খুঁচিয়ে খুন করে বাড়ির দুই পরিচারককে। তারপর প্রণব সাঁই, মলয় সাঁই এবং উদয় সাঁইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। তা দেখে তাদের মা মৃগনয়নাদেবী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। খুনিরা রক্ত আঁজলা করে তুলে মৃগনয়নাদেবীর গায়ে ছিটিয়ে দেওয়ার সময় ওই রক্ত ছিটকে পড়ে বিনয় কোঙারের শার্টের কয়েক জায়গায়। গৃহশিক্ষক জিতেন রায়কেও কুপিয়ে খুন করা হয়। স্বর্ণলতা দেবীর এক মাসের সন্তানটিকে কেড়ে নিয়ে তাকে উনুনে ছুঁড়ে ফেলে দেয় খুনিরা। সন্তানকে বাঁচাতে স্বর্ণলতা দেবী ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর শরীরের অনেকখানি অংশ পুড়ে যায়। সেই অবস্থাতেই শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে তিনিও লুটিয়ে পড়েন। এই ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার টি মিশাও যাঁদের বিরুদ্ধে এফ আই আর করেন তারা হলেন—খোকন সেন, বিনয় কোঙার, অমল হালদার, মানিক রায়, রজত ব্যানার্জি প্রমুখ। এঁরা কারা? খোকন সেন ওরফে নিরুপম সেন বর্তমানে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী। অমল হালদার সিপিএমের সম্ভবত বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক। মানিক রায় নামক রত্নটিই নাম ভাঁড়িয়ে এফিডেভিট করে অনিল বসু নামে পরিচিত হয়েছেন। রজত ব্যানার্জি বুদ্ধদেববাবু মন্ত্রী হয়ে আসার পর তাঁর প্রথম সি এ হয়েছিলেন। বিনয় কোঙার তো 'নিজগুণে' সর্বত্র পরিচিত। বিনয় কোঙারের ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। সাড়ে ছ-সাত বছর জেল খাটার পর ১৯৭৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সরকার ক্ষমতায় এসেই ''সাঁইবাড়ি হত্যা'' মামলা প্রত্যাহার করে নিলে বিনয় কোঙার মুক্তি পান। ১৯৫৩ সালের ২২ জুলাই ট্রামভাড়া এক পয়সা বাড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলকাতা পুলিশ মনুমেন্টের নীচে কর্তব্যরত সাংবাদিকদের বেদম প্রহার করেছিল। তার প্রতিবাদে বাংলা সাংবাদিকতার প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার পুলিশকে লক্ষ্য করে লিখেছিলেন—''ইহারা জননীর জঠরের লজ্জা।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ জুলাই, ১৯৫৩)।

—মণীন্দ্রনাথ সাহা, গাজোল, মালদা।

মঙ্গলনিধি

গত মার্চ মাসে ব্যারাকপুর জেলার পানিহাটী নগরের স্বয়ংসেবক সোমক ব্যানার্জি'র পুত্র সোমেশের উপনয়ন অনুষ্ঠানে সোমেশের ঠাকুর্দা সহ-বিভাগ সঙ্ঘচালক শুভেন্দু মিত্রের হাতে ১০০০ টাকা মঙ্গলনিধি হিসেবে তুলে দেন।

স্মরণসভা

বর্ধমান নগর নিবাসী প্রয়াত মথুরামোহন বিশ্বাসের স্মরণসভা গত ২ এপ্রিল বর্ধমান শহরে আয়োজিত হয়। কিষাণ সঙ্ঘের প্রাক্তন কার্যকর্তা শ্রী বিশ্বাসের স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের প্রাদেশিক কার্যকর্তা নন্দলাল কাঠ, অমল ঘোষ, অজিত বারিক, আর এস এসের জেলা কার্যবাহ অলোক সাহা এবং জেলা প্রচারক পরিতোষ দে।

সংস্কৃত-সম্ভাষণ শিবির

সমাবেশ সমাচার

সংস্কৃত-ভারতীর তাম্রলিপ্ত শাখার ব্যবস্থাপনায় গত ১৩ এপ্রিল থেকে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত দশ দিনের এক সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় তমলুক রামকৃষ্ণ মিশনে। শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজ। শিবিরের আচার্যা রূপে পাঠদান করেন উপাসনা অধিকারী ও সুপ্রিয়া শাসমল। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শিবিরে অংশগ্রহণ করে নিজেদের মধ্যে সহজ সরল সংস্কৃত ভাষায় বার্তালাপ করেন। ২৫ এপ্রিল শিবিরের

সংস্কৃত ভারতীর অনুষ্ঠানে হরিময়ানন্দজী মহারাজ, নন্দকুমারজী ও অন্যান্যরা।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতে নাচ, গান ও নাটকের মাধ্যমে দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করে।

এই কার্যক্রমে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের আচার্য-আচার্যাগণ উপস্থিত ছিলেন। কার্যক্রমের সভাপতি ছিলেন মিশনের উপাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ হরিময়ানন্দজী মহারাজ এবং প্রধানবক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত ভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ নন্দকুমারজী। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশ-বিদেশে সংস্কৃত ভাষার স্থিতি এবং আগামীদিনে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে নন্দকুমারজী তাঁর বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতে। হরিময়ানন্দজী মহারাজ দেশের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে স্বামীজীর সুচিন্তিত বক্তব্য তুলে ধরেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মহিষাদল বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা তথা শিবিরের শিক্ষার্থী দেবশ্রী দাস।

রক্তদান শিবির

গত ২৭ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা ভারতীর ব্যারাকপুর জেলার পরিচালনায় এবং নীলরতন সরকার ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় বার্ষিক রক্তদান শিবির আয়োজিত হলো কামারহাটিতে। শিবিরে ৪ জন মহিলা সহ মোট ৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। নিত্যানন্দ দেবনাথ, ডাক্তার জগন্নাথ ব্যানার্জি, শুভেন্দু মিত্র, শৈলেন্দ্রনাথ ভৌমিক, সদানন্দ গোস্বামী, জিতেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা ও সেবাভারতী'র কাজের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। শিবিরে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেবা ভারতী'র কার্যকর্তা ও সঙ্ঘের প্রাক্তন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সেবা প্রমুখ প্রয়াত দিলীপ আঢ্যের আত্মার শান্তি কামনায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

নিমাই মুখোপাধ্যায়

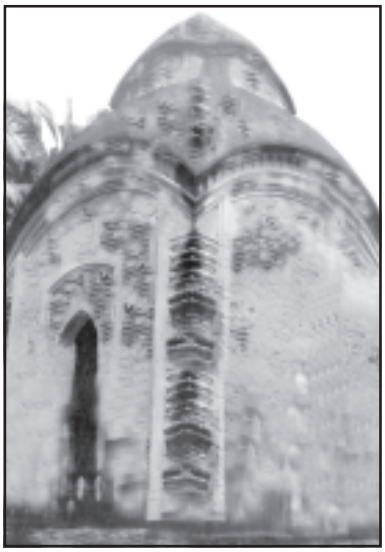

যশোরেশ্বরী যশোরেই আছেন, অম্বরে নয়

যশোরেশ্বরী কালীদেবীর শুধুমাত্র মুখখানি আছে হস্তপদ কিছুই নাই। নিম্নাংশ প্রকাণ্ড নিকষকালো কষ্টিপাথরে নির্মিত একটি পিণ্ড মাত্র।

আমরা রাজস্থানের জয়পুরে গিয়ে অনেকেই অম্বর প্রাসাদ এবং সেখানকার মন্দিরের দেবীকে যশোরেশ্বরী বলে প্রণাম জানাই। অম্বরের রাজা মানসিংহ বাংলার যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে দেবী যশোরেশ্বরীকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন—প্রচলিত এই ধারণাকে মেনে চলি।

এই বিষয়ে কিছু বলার আছে।

ঘটনা হলো : প্রতাপ নিজের ইচ্ছায় আগ্রায় যাননি এবং স্বইচ্ছায় ওড়িশায় পাঠান-মোঘল যুদ্ধে মোঘলদের পক্ষে যোগ দেননি। পিতা শ্রীহরি রায় এবং কাকা বসন্তরায়ের অনুরোধেই গিয়েছিলেন। তাছাড়া সে সময় প্রতাপ যশোরের রাজা ছিলেন না। তিনি ছিলেন যুবরাজ। পিতা শ্রীহরি রায় বা বিক্রমাদিত্য ছিলেন যশোররাজ্যের রাজা।

বরঞ্চ আগ্রায় গিয়ে সেখানে প্রতি ঘরে ঘরে রাণা প্রতাপের স্বাধীনচেতা বীরত্বের কাহিনী শুনে যুবক প্রতাপের মনে স্বাধীনতার যে বীজমন্ত্র অঙ্কুরিত হয়েছিল তার ফল স্বরূপ প্রতাপ পিতা এবং কাকাকে, মোঘলদের পক্ষ অবলম্বনের জন্য দেশদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতক বলতেও ছাড়েনি।

কারণ, পাঠান সুলতান দাউদ খাঁর অর্থেই শ্রী হরি রায় যশোরের রাজা হয়েছিলেন। তাই প্রতাপকে মধ্যযুগীয়, ভুঁইফোঁড় মানসিকতার জমিদার বা মানুষ বলাটা আদৌও শোভন বা সমীচীন বলে মনে করার কোনও অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

সে যুগে তাঁর মত স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক জমিদার বা রাজা বঙ্গদেশে আর ছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রতাপের শরীরেও তো রাজরক্ত ছিল। যে কোন রাজবংশের শুরু তো প্রথম একজনকে দিয়েই হয়। বংশ পরম্পরায় চললে তবেই তা প্রাচীনত্ব লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, ভারত বা বঙ্গের ইতিহাস তো বটেই পৃথিবীর যে কোনও দেশের ইতিহাসে এমন কোনও রাজা, বাদশাহ্ বা সুলতান আছে কি যারা নিজ নিজ রাজক্ষমতা এবং রাজ্য রক্ষার্থে হিংসা কপটতা কূট কৌশল, গুপ্ত হত্যা এবং অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেনি। তেমন কোনও ইতিহাস যদি পাওয়া যায় তবে প্রকৃত ইতিহাস মিথ্যা এবং তাহা অচিরেই লুপ্ত হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী প্রতাপাদিত্য মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং তিনি প্রতাপকে লোহার খাঁচায় বন্দী করে ঢাকায় নিয়ে যান। ঢাকা থেকে আগ্রায় যাওয়ার পথে বারানসীতে মারা যান। এবং যশোরেশ্বরী দেবীকে অম্বরে নিয়ে গিয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতাপের সঙ্গে মানসিংহের যুদ্ধ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মানসিংহ প্রতাপের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মানসিংহ যশোর রাজ্য থেকে কোনও দেবী মূর্তি অম্বরে নিয়ে যাননি। এবং প্রতাপকে বন্দী করেও নিয়ে যাননি।

মানসিংহ শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের ইষ্ট দেবতা সল্ল্যাদেবী বা শিলাদেবীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, যশোরেশ্বরী কালীদেবীর শুধুমাত্র মুখখানি আছে হস্তপদ কিছুই নাই। নিম্নাংশ প্রকাণ্ড নিকষকালো কষ্টিপাথরে নির্মিত একটি পিণ্ড মাত্র। অথচ অম্বরের শিলা দেবী অষ্টভুজা ক্ষুদ্রকায়া সুন্দর দুর্গামূর্তি, কিন্তু যশোরেশ্বরী মূর্তি মুখমাত্রবিশিষ্ট লোলরসনা ভীষণাকার কালীমূর্তি।

এখনও প্রতিদিন ঈশ্বরীপুরে দেবীর পূজা হয়, এবং প্রচুর লোক সমাগম হয়। বলা বাহুল্য যে আমি নিজে বেশ কয়েকবার ঈশ্বরীপুরে গিয়েছি পূজা দিতে।

ঈশ্বরীপুরের পূর্বে নাম ছিল যশোর-ঈশ্বরীপুর, বর্তমানে শুধু ঈশ্বরীপুর। বর্তমান বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার মানচিত্রে একেবারে দক্ষিণে শ্যামনগর থানার দুই কিলোমিটার দক্ষিণে ঈশ্বরীপুর।

বহারিস্থানে উল্লেখ আছে যে প্রতাপের সঙ্গে মানসিংহের যুদ্ধ হয়েছিল ১৬০৩ সালে, অথচ ইসলাম খাঁ যখন বাংলার সুবেদার হয়ে আসেন তখন প্রতাপ নানারকম উপঢৌকন নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং নানারকম প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সময়কালে কোনও প্রতিশ্রুতি পালন না করার জন্যে ইসলাম খাঁ ১৬০৯ সালে প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেই যুদ্ধে প্রতাপ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। ইসলাম খাঁ প্রতাপকে লোহার খাঁচায় বন্দী করে ঢাকায় নিয়ে যান। সেখান থেকে আগ্রায় যাওয়ার পথে বারানসীতে প্রতাপের মৃত্যু হয়।

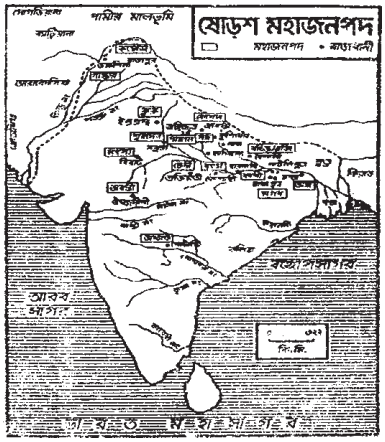

ষোড়শ মহাজনপদ

সুরসেন

গোপাল চক্রবর্তী

প্রাচীন ষোড়শ মহাজনপদের একটি অন্যতম জনপদ সুরসেন। বর্তমান উত্তর প্রদেশের যমুনা নদীরতীরে মথুরা ছিল সুরসেনের রাজধানী। প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা শত্রুঘ্ন মথুরা নগরীর নির্মাণ করেন। শত্রুঘ্নের এক পুত্রের নাম ছিল সুরসেন তাঁরই নামানুসারে রাজ্যের নাম 'সুরসেন' হয় বলে অনুমান। বৈদিক সাহিত্যে কোথাও সুরসেন এবং মথুরা নামের উল্লেখ নেই। গ্রীক লেখকগণ 'সৌরসেনয়' এবং মেথোরা নামের উল্লেখ করেছেন। মহাভারতের যুগের প্রথম দিকে মথুরায় রাজত্ব করতেন কংস নামে এক শক্তিশালী রাজা। তিনি ছিলেম মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা। জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। কংসের অত্যাচারের কাহিনি ভারতবিদিত। তিনি পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। যদুবংশীয় বসুদেবের সঙ্গে তাঁর ভাগিনী দেবকীর বিবাহ হয়েছিল। কথিত আছে দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তানের হাতে কংস নিহত হবে এই দৈববাণী শুনে কংস দেবকীর সাতটি সন্তানকে জন্মমাত্র হত্যা করে। অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন স্বয়ং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ রূপে। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে কংসের নিধন হয়। জামাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে মগধরাজ জরাসন্ধ বারবার মথুরা আক্রমণ করেন তখন শ্রীকৃষ্ণ যাদবকুলকে নিয়ে মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন মহাভারত এবং পুরাণ ছাড়াও পতঞ্জলির রচনায় এবং 'ঘট-জাতকে' এই কাহিনী পাওয়া যায়। খৃঃপূঃ ষষ্ঠ শতকে এই

অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করে। সুরসেনের রাজা অবন্তীপুত্র বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। অবন্তীপুত্রের নাম থেকে অনুমান করা যায় যে সুরসেনের সঙ্গে অবন্তীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বহুশতাব্দী ধরে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল। মহাকাচ্চায়ন জাতপাত সম্পর্কে মথুরায় বৌদ্ধ ভক্তদের নানান উপদেশ দিয়েছিলেন। বুদ্ধ মথুরা থেকে বারানসী যাওয়ার পথে একটি বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে বহু সুরসেনবাসী তাঁকে পূজা নিবেদন করেছিলেন।

মেগাস্থিনিস যখন সুরসেন সম্পর্কে লেখেন তখন সুরসেন সম্ভবত মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি মথুরাকে কৃষ্ণ (হেরাক্লেস) উপাসনার প্রধান ক্ষেত্র বলে উল্লেখ করেছেন। কুষান প্রতিপত্তির যুগে মথুরা আবার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে। বুদ্ধের বহু মূর্তি এখানে খনন করে পাওয়া গেছে।

কাজের-অকাজের হিসেব এবং টাকার হিসেব

রমাপ্রসাদ দত্ত

'হিসেব চাই, হিসেব দাও'—এ স্লোগান রাজনীতিওয়ালাদের। এ স্লোগান ব্যবসায়ীদেরও। একই কথা নরম গরম সুরে বলা হয় ছোট বড় সংস্থায়। এমনকী পারিবারিক স্তরেও। ধর্মবিশ্বাসীরাও ওই হিসেবের বাইরে নন। অনেক সময় ছেলের উপর রেগে গিয়ে বাবা মা বলেন, 'তোমার জন্যে কীরকম খরচ হচ্ছে সে হিসেব রাখো?' এই হিসেবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে টাকা পয়সা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা।' কিন্তু তাঁর দেহান্তের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আমরা সন্ন্যাসী। আমাদের যা খরচ হয় তা অন্যের পয়সা। সেজন্যে পাই-পয়সার হিসেব রাখতে হবে।'

এই হিসেব মেলানোর ব্যাপারটা সবসময় থাকে। বেশকিছু বছর ধরে দেখা যাচ্ছে ভালো কাজে খরচ করলে অর্থাৎ সদ্ব্যয়ের দরুন আয়কর বিভাগের বিশেষ ছাড় মেলে। অতীতে আয়করের থাবা ছিল না। অন্যান্য করের বোঝা কম ছিল। কিন্তু আয় হোক বা না হোক কিছু কর দিতেই হোত ভূ-স্বামীকে। কিংবা কোনও-না-কোনও জায়গায় ধর্মের উপর কর বসানো হয়েছে। এক ধর্মবিশ্বাসীর দাপটের সময়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা বেশ জোরদার থেকেছে। টাকা না দিতে পারলে অন্য যে কোনও জিনিস চাই। ধর্ম করবে, অথচ কিছু দেবে না—এসব চলতে পারে না।

অতএব একটু চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যাবে—হিসেব কষেই সব এগোচ্ছে। ওভাবেই পা তোলা, পা ফেলা। এখন প্রশ্ন, হিসেব কেমন হবে? সোজা হিসেব? বাঁকা হিসেব? নকল হিসেব? এক এক ক্ষেত্রে একেকরকম হিসেব। সব হিসেবের ছক একরকম হতে পারে না। হিসেব মেলানোর জন্যে বংশবদ লোকজন রাখতে হয়। প্রকৃত হিসেব আর প্রদর্শনযোগ্য হিসেব একরকম না হওয়াই স্বাভাবিক। গোপনীয়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য লোকজন খুঁজে নেওয়া জরুরি। অনেক দক্ষ ব্যক্তি গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারেন না। নেশার ঝোঁকে কিংবা আবেগে বহু গোপন তথ্য বলে ফেলেন এমন জায়গায় যেখান থেকে সব গোপনীয়তার বেড়া পেরিয়ে পাঁচ কান হতে সময় লাগে না।

কর বিভাগের লোকজনরা সবসময় জাল পেতে শিকার ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে। আর কর ফাঁকি দেওয়ার নানান কৌশল একই সঙ্গে রপ্ত করছে করদাতাদের একটা বড় অংশ। করজালে জর্জরিত বহু মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু লোকের হিম্মত থাকে কর বিভাগের সব কেরামতিকে বুড়ো আঙুল দেখাবার। কর ফাঁকি দেওয়ায় দক্ষ ব্যবসায়ী আইনের জালে ধরা পড়লেও বেরিয়ে আসার অনেক রকম পথ বা পদ্ধতি জেনে রাখায় তাকে আটকে রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

হিসেবকে এমন বিশ্বাসযোগ্য রূপ দিতে হবে,

সিপিএম কি টাকার কোনও হিসেব দেয় কোথাও?

যাতে বেপরোয়া বেহিসেবি কাণ্ড হলেও কাগজপত্র ঠিক থাকে। টাকাকড়ির ক্ষেত্রে সাদা আর কালো দুরকম শব্দই ছোটরা শিখে গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই কালো টাকা খেয়ালখুশি মতো ব্যয় হয়েছে। ভালো কাজেও লোকে ভুল বুঝেছে। সাদা টাকা নিয়ে খুব বেশি দৌড়ানো যাবে না। ওঁত পেতে থাকা লোকজন সে টাকা ছিনতাই করে নেবে। পালাবার পথ নেই।

নানা সূত্রে টাকা কামানোর পর যখন আয়কর বিভাগ বাজপাখির মতো তা ছিনিয়ে নিতে তৎপর, তখন অন্য পথের সন্ধান জরুরি হয়ে উঠেছে। আগে হিসেবের ব্যাপার যিনি দেখাশোনা করতেন তিনিই টাকাকড়ি নাড়াচাড়ার দায়িত্বে থাকতেন। টাকার প্রকৃত মালিকের জানা থাকত না, কত সঞ্চিত আছে, কত ব্যয় হয়েছে, কত ব্যয় হবে। টাকাকড়ির মালিক দরাজদিল হতে অসুবিধে নেই। কিন্তু উদার হস্তে ব্যয় করলে সঙ্কট বা সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য। টানাটানির সংসার একরকম। উদ্বৃত্ত অর্থের সংসার আরেকরকম। বেহিসেবি অর্থ ব্যয় করলে অন্যরকম পরিস্থিতি দেখা দিতে বাধ্য।

কথায় বলে, 'খেয়েদেয়ে থাকে ধন, তাকে বলে উপার্জন।' উপার্জন এবং যথেচ্ছ ব্যয়ের অধিকার থাকলেও করবিভাগ নানাভাবে জব্দ করার জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছে। সেই ফাঁদ পাতা রয়েছে সর্বত্র। কীভাবে তা ফাঁকি দেওয়া যাবে মোটা টাকা উপার্জকদের ক্রমাগত ভাবতে হচ্ছে। জাল যতই বিস্তার করুক কর বিভাগ নিস্তার পাওয়ার পথও সবসময় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। আসলে কর চাপানোর জন্যে একদল বিশেষজ্ঞ তৎপর, তার থেকে বেশি তৎপরতা আরেকদল বিশেষজ্ঞের করের জালকে তুচ্ছ করার ব্যাপারে। আক্রমণ এলে যেমন তা রোখার ব্যবস্থা থাকে, এসব ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। এর ফলে কি দাঁড়াচ্ছে? প্রতি বছর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর বাড়ছে। কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে। দেশের অর্থনীতি বিপন্ন হচ্ছে নানাভাবে।

আমাদের দেশের সরকারি ব্যয়ের প্রায় সমস্ত টাকাটাই আসে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। করদাতাদের সেই টাকায় বেতন হয় সরকারি কর্মীদের। বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় হয়। সরকারি কর্মীরা যদি নিজেদের কাজ ঠিকভাবে না করেন এবং 'আসবো যাবো মাইনে পাবো, কাজ করবো না'—এই মনোভাব প্রবল থাকে তাহলে জনগণের দেওয়া করের অর্থ অপব্যয় হতে বাধ্য।

একই সময়ে নানাদিকে কাজ করছে বিভিন্ন এন-জি-ও। কতটা কাজ হচ্ছে? প্রকৃত কাজের বহর আর না কাজের বাহার কেমন? আমাদের এখানে বহুরকম এন জি ও কাজ করছে। 'কাজ করছে' শব্দ দুটোর অনেকরকম অর্থ। প্রকৃত কাজ আর কাজ দেখানো কাজে তফাত আছে যথেষ্ট। আবার কাজের নাম করাও আরেক ব্যাপার। কাগজপত্রে ফলাও করে কর্মসূচি ও পরিকল্পনা পেশ। টাকাপয়সা মিললে কিছু কাজ দেখানো। মূল টাকার কত অংশ কোন্ দিকে যাবে সে হিসেব কষে নিতে হয় আগেভাগে। খরচ দেখাতে হবে কাগজপত্রে। যাদের নাম করে টাকা আনা তাদের জন্যে নমো নমো করে একটু আধটু কাজের পর বাকি অর্থ আত্মসাৎ। এমন কৌশলে টাকা সরাতে হবে যাতে দ্রুততা এবং দক্ষতা থাকবে। কেউ কোনও প্রশ্ন করবে না। আমাদের দেশে অধিকাংশ এন জি ও পুরোপুরি লাভের মনোভাব নিয়ে এগোনোর ফলে বিভিন্ন সূত্রে আসা টাকা উবে যাচ্ছে। যাঁদের নাম করে টাকা আসছে তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছেন।

পাশাপাশি কিছু এন-জি-ও পুরোপুরি জনকল্যাণের কাজ করছে। এরাজ্যে একসময় সিপিএম দল ফতোয়া দিয়েছিল—যারা এন-জি-ও'র টাকা নেবে তাদের আমাদের মাধ্যমে টাকা নিতে হবে। কোনও কোনও নতজানু সংস্থা সেই ফতোয়া মেনেছে। আর কিছু মেরুদণ্ড সোজা রাখা সংস্থা স্পষ্টভাষায় জানিয়েছে, 'আমরা যেভাবে চলেছি সেভাবেই চলবো। টাকা সোজাসুজি নেবো। কারও মাধ্যমে নয়। সিপিএম কি টাকার কোনও হিসেব দেয় কোথাও?' অনেক সংস্থা ওইভাবে এগিয়ে চলেছে। প্রকৃত হিসেব দিয়ে এবং সত্যিকারের কাজ করে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল

সালফাদের মধ্যে শুরু হয়েছে দলাদলি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উলফা'র শান্তিবার্তাপন্থী জঙ্গি নেতা মৃণাল হাজারিকা এবার সরাসরি কমাণ্ডার ইন্ চীফ্ পরেশ বরুয়াকে আই এস আই এজেন্ট বলে অভিযোগ করলেন সংবাদমাধমের কাছে সর্বসমক্ষে। এমনকী মৃণালের অভিযোগ—পরেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকেও অর্থসংগ্রহ করে।

পরেশ বড়ুয়া

মৃণাল হাজারিকা

শ্রী হাজারিকার পরেশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ --- পরেশ শান্তিবার্তার বিরোধিতা করে ভারত-ভাগের ষড়যন্ত্র করছে। তিনি গত ৬ মে ডিব্রুগড়ের জামিরা তিনিআলিতে ''স্বাধীন অসমের প্রাসঙ্গিকতা, মূল স্রোত এবং তার দুঃখকষ্ট—সমস্যা ও সমাধান''-শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য প্রসঙ্গে পরেশ বরুয়াকে তুলোধুনা করেন। অখণ্ড ডিব্রুগড়-তিনসুকিয়া জেলার মূলত সালফা (আত্মসমর্পণকৃত উলফা ক্যাডার) জঙ্গিদের উদ্যোগেই সেমিনারটি আয়োজিত হয়েছিল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীহাজারিয়া অবশ্য সম্প্রতি সিণ্ডিকেটের মাধ্যমে তোলাবাজি নিয়ে কড়া ভাষায় মন্তব্য করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সেমিনারে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ্ ডঃ দয়ানন্দ বরগোহাঞি সভাপতিত্ব করেন।

শ্রীহাজারিকার কথায় অসমের জনসংখ্যার ভারসাম্যের রদবদলে স্বাধীন অসমের ঐতিহাসিকতার বিষয়টা প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার জন্য দু'টি আবশ্যিক বিষয় হলো অর্থব্যবস্থা এবং সেনাবাহিনী। কিন্তু বর্তমানে স্বাধীন অসমের জন্যে এদুটো থাকা সম্ভব নয়। তিনি ডিব্রুগড়-তিনসুকিয়ার সালফা ক্যাডারদেরকে তাদের প্রাক্তন সতীর্থ ও সহকর্মীদের পুনর্বাসনের প্রয়াসে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। এদিকে দক্ষিণ কামরূপ জেলা প্রাক্তন 'উলফা' সমন্বয়রক্ষা সমিতি এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়ে দিয়েছে যে, কয়লা এবং অন্যান্য ব্যবসায় তথাকথিত উলফা নেতা মৃণাল হাজারিকাকে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না। হাজারিকার অবৈধ সিন্ডিকেট ঢুকে পড়লে সন্ত্রাস ও ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি বাড়বে বলে দাবী করেছেন সমিতির সম্পাদক মর্মেশ্বর দাস। প্রেস বিবৃতিতে মর্মেশ্বর বলেছেন, সরকারের সঙ্গে শান্তিবার্তার নামেই মৃণাল হাজারিকা, জিতেন দত্ত এবং তথাকথিত উলফা নেতারা সংগঠন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন অথবা বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

ওই বিবৃতিতে ব্যবসায়িক সিণ্ডিকেট-কে কঠোরভাবে নিন্দা করে অরবিন্দ রাজখোয়াকে শান্তিবার্তার উপলক্ষে এগিয়ে আসার জন্য স্বাগত জানানো হয়েছে। আর সিণ্ডিকেটের ব্যাপারে রাজখোয়ার অবস্থানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। এছাড়া বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে— চৌদ্দ বছর আগে রমেশ গান্ধীর মতো কয়লা মাফিয়ার হাত থেকে 'সালফা' ক্যাডারদের সহযোগিতায় কয়লার ব্যবসা নিজেদের হাতে এসেছে। ওখানে বিরাট সংখ্যায় বেকার যুবকরা যুক্ত রয়েছে। মৃণাল হাজারিকার মতো নেতারা হস্তক্ষেপ করলে ভ্রাতৃঘাতী খুনোখুনি বাড়বে।''

অসমে উলফাদের তোলাবাজি চলছে

সংবাদদাতা ॥ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দেদার তোলা আদায় চলছে গুয়াহাটিতে। বিশেষ করে কয়লা ব্যবসায়। আর এক্ষেত্রে দাদাগিরি করছে সরকারের স্নেহধন্য 'সালফা' (সারেন্ডারড্ ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম) ক্যাডাররা। একই গোষ্ঠীর দুজনের মধ্যে সম্ভবত বখরা নিয়ে ঝামেলা বাধায় একজন অন্যের বাড়িতে গিয়ে সোজা একে ৪৭ তুলে ধরে দাবড়ে এসেছে। ওই সালফা ক্যাডারের নাম শৈলেন দত্ত কনোয়ার। তাকে যে হুমকি দিয়েছে তার নাম ময়ূর তালুকদার। ময়ূরের বাড়ি গুয়াহাটি শহরের কারবি-পথে গীতানগর থানার এলাকায়। এই ঘটনা ঘটেছে অতি সম্প্রতি গত ২৬ এপ্রিল।

মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ এই 'সিন্ডিকেট'-কে দমন করার প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনও কাজের কাজ করেননি। প্রতিদিন অসম থেকে হাজার হাজার মালগাড়ির বগি ভর্তি কয়লা অসমের বাইরে যায়। আর এই বগিপ্রতি ৭০০ টাকা হিসেবে তোলা আদায় করে সালফারা। আর সেটা নিয়েই যত গণ্ডগোল।

কারও কারও মতে আলোচনা ও শান্তিবার্তার পক্ষে যেসকল আত্মসমর্পণকারী উলফা নেতারা আছেন, তারাই ওই সিন্ডিকেট নতুন করে চালু করেছেন গতবছরেই। এরা এককালে স্বাধীন অসমের স্বপ্ন দেখতেন। পরে মূল স্রোতে ফিরে অসমের মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে আলোচনার পক্ষপাতী। একসময়ে অসমের যুব কংগ্রেসীরাও এই ধরনের সিন্ডিকেট চালু করেছিল বলে অভিযোগ। ১৯৯৬-২০০১-এ সালফাদের এরকম তোলাবাজি যত্রতত্র চেকপোস্টে দেখা যেত।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে তরুণ গগৈ-এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসই এবার জনাদেশ লাভ করেছে। তাই তাদেরকে জনস্বার্থেই এই সিন্ডিকেট দমন করতে হবে।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর ''চিঠিপত্র'' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

— সঃ স্বঃ

নির্বাচনী ফলাফলে বিধ্বস্ত বিরোধীপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অসমে বিধানসভার নির্বাচন হয়েছিল এবার সবচেয়ে আগে। রীতি মেনে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গেই ফলাফল প্রকাশিত হলো। পশ্চিমবঙ্গে বাম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুর পরাজয় যদি অপ্রত্যাশিত বলে গণ্য হয়, তাহলে অসমে গগৈ সরকার-এর হ্যাটট্রিকও সমানভাবে বিরোধী ও বিশ্লেষকদের কাছে অপ্রত্যাশিত। কোনও বিশ্লেষকই এবার অসম কংগ্রেসকে ৪৫-৫০-এর বেশি আসন দিতে চাননি। অথচ সেখানে ১২৬ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় কংগ্রেস একাই ৭২টি আসনে জয়লাভ করেছে। আজ থেকে দশবছর আগে ২০০১-এর নির্বাচনে কংগ্রেস এককভাবে ৭৩টি আসনে জয়লাভ করেছিল। এবার তাবড় তাবড় বিশ্লেষকরা অসম বিধানসভা 'হ্যাং' বা ত্রিশঙ্কু হচ্ছে বলে নির্দিষ্ট মতামত দিয়েছিলেন। খুশীতেই ছিলেন অগপ-বিজেপি-এ আই ইউ ডি এফ নেতৃত্ব। ভেবেছিলেন এবার তাঁরাই 'কিং মেকার' হবেন। কংগ্রেস এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় তাদের যাবতীয় আশা-ভরসা মাঠে মারা গেল।

কংগ্রেসের বিপুল জয় সত্ত্বেও লাভবান হয়েছে কিন্তু বদরুদ্দিন আজমলের দল এ আই ইউ ডি এফ। তাঁদের আসন গতবারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হলেও অগপ-বিজেপির আসন কমাতে তারা 'কিং মেকার' হতে পারল না। তবে বিজেপি ২৪টি আসনে দ্বিতীয় স্থানে এসেছে। যেখানে ২০০৯-এ বরাক ভ্যালির শিলচর লোকসভা আসনে প্রবীণ বিজেপি নেতা কবীন্দ্র পুরকায়স্থ জিতলেও এবারকার ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে বরাক ভ্যালি থেকে মুছে গেছে। এর একটা বড় কারণ ব্যাপকহারে কংগ্রেস বিরোধী ভোট ভাগাভাগি এবং বহুকোণীয় প্রতিযোগিতা। বরাকভ্যালির একমাত্র আলগাপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে অসম গণপরিষদ প্রার্থী শহীদুল আলম চৌধুরীর জয়লাভ উল্লেখ করার মতো। প্রায় সব কয়টি বিরোধী দলই ব্যাপক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত যার কিছুটা প্রতিফলন প্রচারসভাতেও দেখা গেছে। একজন বিজেপি নেতা গোঁসা করে সর্বভারতীয় নেত্রীর অনুরোধেও সভামঞ্চে আসন গ্রহণ না করে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বীয় সমর্থকদের কাছে ভুলবার্তা দেন।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬-এর নির্বাচনে বরাক ভ্যালি লোকসভা, বিধানসভা এবং স্থানীয় পুরনির্বাচনে বিজেপি'র ভোটের ঝুলি ভরে দিয়েছিল। কিন্তু জনাদেশের সেই মর্যাদা রক্ষিত হয়নি। এছাড়া গত জনগণনায় বরাক ভ্যালির তিনটি জেলাই মুসলিম বহুল হয়ে গেছে। আর বিজেপি'র বিরুদ্ধে বাজারে অপপ্রচার—কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের দল। যদিও 'হিন্দুত্ব' সর্বসমাবেশক— কারও বিরোধী নয়। এটা জেনেবুঝেও 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই ভেবে অনেকে এড়িয়ে যান। হিন্দুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব এবং সেকারণে অন্যকে বোঝানোর অক্ষমতাই বিজেপির ভোট ব্যাঙ্ককে প্রসারিত করতে পারেনি। হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক বলে কিছু হয় না---এই ধারণাও একটা বড় প্রতিবন্ধকতা। আর এসবেরই সুযোগ নিয়ে দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জমান কংগ্রেসই এবার সব থেকে বেশি প্রাণশক্তি পেল। অন্যদের জন্য লড়াইটা আরও কঠিন হয়ে গেল।

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন। — **ব্যবস্থাপক**

অগপ-বিজেপি'র সমঝোতার অভাবে অসমে ক্ষমতায় কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অসম বিধানসভা নির্বাচনে এবার শাসক কংগ্রেস আশাতীত সাফল্যলাভ করেছে। এমনকী কংগ্রেসের দলীয় ম্যানেজাররা যা অনুমান করেছিলেন তার থেকেও কুড়িটি আসন বেশি পেয়ে তরুণ গগৈ এবার হ্যাটট্রিক করলেন। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে বিশ্লেষকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কংগ্রেস আশাতীতভাবে হিন্দু ও জনজাতিদের ভোট টানাতেই এই বিরাট সাফল্য। হিন্দু এবং জনজাতিরা কংগ্রেসকেই ভোট দিয়েছে যদিও বিরোধীরা তাদেরকে 'মুসলিম তোষণকারী' বলে প্রচার করে গেছেন। এরই ফলে ভারতীয় জনতা পার্টি ও অসম গণপরিষদের ব্যাপক 'সেটব্যাক' সম্ভব হয়েছে।

আবার ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোট নিজেদের দলের অনুকূলে টানতে পেরেছে দেওবন্দ অনুগামী ও মুসলিম স্বার্থরক্ষাকারী দল অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট। যে দলের নেতা ধনকুবের আজমল শেঠ ওরফে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। অগপ-বিজেপি মিলিতভাবে ক্ষমতায় এলে অসমে ঢুকে পড়া বাংলাদেশী মুসলমানদের পক্ষে অসুবিধা হোতই। এবার বদরুদ্দিনের দলই রাজ্যে সর্ববৃহৎ বিরোধীদলের মর্যাদা পাচ্ছে ১৮টি আসনে জিতে। তাদের দলে কংগ্রেসের থেকেও বেশি মুসলমান বিধায়ক। এ থেকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মেরুকরণ ও মুসলমান মানসিকতাটা ভালোভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে। অপরপক্ষে কংগ্রেস প্রো-মাইনরিটি স্ট্যাণ্ড নেওয়ার পরও হিন্দু ভোট ব্যাপকহারে তাদের ঝুলিতেই পড়েছে। ফলে হিন্দুদের পক্ষ অবলম্বনকারী বলে (বাজারে যা চালু) পরিচিত ভারতীয় জনতা পার্টি দারুণভাবে আশাহত হয়েছে। এরা সদাসর্বদা সীমাপার থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে—তাদেরকে অসম থেকে বিতাড়নের জন্য। কিন্তু ভোটের বাক্সে তার প্রতিফলন আদৌ হয়নি। বরাক উপত্যকা গত দুই দশক যাবৎ বিজেপি'র শক্ত ঘাঁটি বলে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু মোট ১৫টি আসনের মধ্যে মাত্র দুটি—অর্থাৎ একটি করে আসন পেয়েছে অগপ এবং বদরুদ্দিনের দল। বিজেপি'র এবারকার পাঁচটি আসনই এসেছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে। অথচ শিলচর লোকসভা কেন্দ্র বিজেপি'র দখলে।

বিজেপি নেতা কবীন্দ্র পুরকায়স্থ স্বীকার করে নিয়েছেন যে বিরাট সংখ্যক হিন্দুরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন আর দলের একতার অভাবও ছিল। ফলাফলে তাঁরা হতোদ্যম হলেও শিগগিরই বিশ্লেষণে বসবেন বলে শ্রীপুরকায়স্থ জানিয়েছেন।

কেরলেও বিধ্বস্ত বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গের পর কেরল। পতন আরেক বাম-দুর্গের। এরপর কি ত্রিপুরা? উত্তরটা জানতে আপাতত ২০১৫ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও গতি নেই। কিন্তু ২০১৪-য় সম্ভাব্য লোকসভা নির্বাচনেও সংসদে বামেদের দাদাগিরি করার যুগ যে শেষ তা বোঝানোর প্রথম ভূমিকা যদি নেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, তবে এনিয়ে দ্বিতীয় ভূমিকাটি গ্রহণ করলেন কেরলের মানুষ। এমনিতে ৫ বছর অন্তর পালাবদল কেরলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। তবে কেরলের মানুষ কংগ্রেসকেও এবার ভালচোখে গ্রহণ করেননি। যে কারণে ২০০৯-এ লোকসভায় প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় এবার ভোট কম পড়েছে কংগ্রেসের ভোট-বাক্সে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কেরলের রাজনীতিতে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এফ এবং সিপিএমের নেতৃত্বাধীন এল ডি এফ বাদে আর কোনও রাজনৈতিক দল ও কর্মসূচীর অস্তিত্ব নেই। যেজন্য মানুষ বাধ্য হয়ে দু'টোর মধ্যে যে কোনও একটাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তবে মন থেকে এদের কতটা মেনেছেন তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এই কারণেই '৫ বছর অন্তর পালাবদলে'র সূত্র মেনে ইউ ডি এফ ক্ষমতাসীন হয়েছে ঠিকই কিন্তু কংগ্রেসী রাজনীতি ও দুর্নীতি নিয়ে অসন্তোষের কারণেই ব্যবধান খুবই সামান্য থেকেছে এল ডি এফের থেকে। তবে এল ডি এফ-এর বিরুদ্ধে পালাবদলের হাওয়া জোরদার না হওয়ার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসেবে প্রথমত যদি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অসন্তোষই দায়ী হয়, দ্বিতীয় পয়েন্ট অবশ্যই বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ভি এস অচ্যুতানন্দন। দলের মধ্যে কারাটপন্থী বলে সু-পরিচিত কেরলের রাজ্য-সম্পাদক পিনারাই বিজয়নের লাভলিন সহ একাধিক দুর্নীতি'র বিরুদ্ধে অচ্যুতানন্দনের সরব হওয়া তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে এবং তার ফলেই এল ডি এফ হারের ব্যবধান কমাতে পেরেছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

মোট আসন— ১৪০

ইউ ডি এফ	**এল ডি এফ**
জাতীয় কংগ্রেস- ৩৮	**সিপিএম**— ৪৫
আই ইউ এম এল- ২০	**সিপিআই**— ১৩
অন্যান্য— ১৪	**জে ডি এস**— ৪
	এনসিপি— ২
	আর এস পি— ২
	অন্যান্য— ২
মোট আসন সংখ্যা– ৭২	**মোট আসন** — ৬৮

তামিলনাড়ু : দুর্নীতিতেই ধরাশায়ী কংগ্রেস-ডি এম কে

জয়ললিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এমনটা যে হবে ভোটের আগে ঘূণাক্ষরেও টের পাওয়া যায়নি। কিন্তু তামিলনাড়ুর মানুষ তাঁদের নির্বাচনী দিশা স্থির করেই ফেলেছিলেন যে দুর্নীতিগ্রস্তদের এবার ঘাড়ধাক্কা দেবেনই দেবেন। আর সেই ধাক্কাতেই এক লহমায় বাস্তবের কঠিন মাটিতে ডি এম কে-কংগ্রেস- পি এম কে-র ত্রিমূর্তি জোট। তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করা এ আই এ ডি এমকে নেত্রী জে জয়ললিতা নিজেও ঘনিষ্ঠ মহলে স্বীকার করে নিয়েছেন যে তাঁর কাজটা অনেক বেশি সহজ করে দিয়েছিল প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী এ. রাজা। কারণ টু-জি স্পেকট্রাম দুর্নীতি কাণ্ডে রাজা যখন পদত্যাগ করেন, তার আগেই তামিলনাড়ুর জনগণ যা বোঝার বুঝে গিয়েছিলেন। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো জেলের ভেতরেই, তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু করুণানিধি কন্যা কানিমোঝি কেন এড়িয়ে চলছেন এনিয়ে রাজার কান্না তামিলনাড়ু সরকারের গায়ে আরও কালি লেপে দিয়েছিল। যার নীটফল জয়ললিতার এ আই এ ডি এম কে জোট ২০৩টি, ডি এম কে এবং তার সহযোগী কংগ্রেস-পি এম কে সর্বসাকুল্যে পেয়েছে ৩২টি আসন। গতবারের তুলনায় ১৩২টি আসন কম। পক্ষান্তরে জয়ললিতার জোট ১৩৪টি বেশি আসনে জয়লাভ করেছে।

তামিলনাড়ুর ভোটে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ঘটনা হলো, করুণানিধির শক্ত ঘাঁটি চেন্নাইতেও ভরাডুবি হয়েছে ডি এম কে-র। চেন্নাই ছাড়াও উত্তরের কৃষ্ণগিরি থেকে দক্ষিণের মাদুরাই, পূর্বের নাগাপত্তিনম থেকে পশ্চিমের কোয়েম্বাটোর সর্বত্রই ডি এম কে-র ভরাডুবির ছবি। নির্বাচনী সমীক্ষায় জয়ললিতা ভার্সেস করুণানিধির একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা ছিল ঠিকই কিন্তু জয়ললিতা'র দল একাই ১৫১টি আসনে জয় ছিনিয়ে নেবে, এটা বোধহয় অতিবড় এ আই এ ডি এম কে সমর্থকও ভাবতে পারেনি। এবার নিজের কেন্দ্র বদলে মধ্য-তামিলনাড়ুর শ্রীরঙ্গম থেকে দাঁড়িয়েছিলেন জয়ললিতা। প্রত্যাশার চাইতেও বিপুল ভোটে জিতেছেন তিনি। অন্যদিকে কোলাথুলে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী পুত্র স্ট্যালিন হেরে গিয়েছেন।

একনজরে তামিলনাড়ু বিধানসভা

দল	২০০৬	২০১১	পার্থক্য
এডিএমকে জোট	৬৯	২০৩	+১৩৪
ডিএমকে জোট	১৬৩	৩১	–১৩২

ডি এম কে মন্ত্রীদের হাল পশ্চিমবঙ্গের মতোই। পরাজিতদের তালিকায় রয়েছেন অর্থমন্ত্রী কে আনবাঝাগন, শিক্ষামন্ত্রী কে পোনমুড়ি, খাদ্যমন্ত্রী ই ভি ভেলু, পরিবহনমন্ত্রী কে এন নেহরু, স্বাস্থ্যমন্ত্রী পনিরসেলভান, কৃষিমন্ত্রী বীরাপান্ডি অরুমুগম প্রমুখ। ডি এম কে-র জোটসঙ্গী কংগ্রেসের অবস্থাও তথৈবচ। কংগ্রেসের তাবড় নেতা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি কে ভি থাঙ্কাবালু পরাজিত হয়েছেন নিজের ঘাঁটি মায়লাপোরেই।

জয়ললিতা সাংবাদিকদের এই জয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'অর্থশক্তির বিরুদ্ধে জনগণের রোষের বহিঃপ্রকাশ'কেই মুখ্য কারণ হিসেবে বিবেচনা করছেন। ওয়াকিবহাল মহল, এর সঙ্গে রাজ্যের শাসক দলের দুর্ব্যবহার ও পেশীশক্তিকেও জুড়তে চাইছেন।

নরেন্দ্র মোদীর চিঠি মমতা ব্যানার্জীকে

‘প্রথম রাতেই বেড়াল মেরে দিন’

আদরণীয়া মমতাবেন,

প্রথমেই আপনাকে জানাই আমার অভিনন্দন।

আপনার কাছে আমার গগনচুম্বী প্রত্যাশা। কিন্তু প্রথমেই বলি, প্রথম রাতেই বেড়াল মেরে দিন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বললাম। ভাববেন না জ্ঞান দিচ্ছি। আপনি একজন একনিষ্ঠ দৃঢ়চেতা মুখ্যমন্ত্রী, আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং বাঙালির সচেতনতার ওপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। কিন্তু প্রশাসনে কঠোরতা খুব আবশ্যক। এই কঠোরতা শুরুতেই আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করি।

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক আমাকে বলেছেন, আমি যদি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতাম তা হলে আজ আমি বাংলার জন্য কী করতাম? কী ভাবে এগোতাম—সেটা নিয়ে আমাকে একটা লেখা মকশো করতে বলা হয়েছে।

আমি বিষয়টিকে যদি একটু অন্য ভাবে দেখি?

মুখ্যমন্ত্রী নয়। আমি যদি বাংলার একজন নাগরিক হতাম, আমি যদি বাংলার একজন ভোটার হতাম, তা হলে পশ্চিমবাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমার কী প্রত্যাশা হোত। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নয়, একজন আম-আদমি হিসেবে নরেন্দ্র মোদী কেয়া চাহতা হ্যায়?

বৃটিশ বণিক সুরতেও এসেছিল, বাংলাতেও এসেছিল। কিন্তু সুরতে নয়, তারা বাংলায় আড্ডা জমাল কেন? কলকাতা কী ভাবে এবং কেন বৃটিশদের রাজধানী হয়ে উঠল? আসলে বাঙালির মেধার উৎকর্ষ ছিল, অর্থনৈতিক সক্ষমতা ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে যারা দিল্লিতে বসে শাসন করেন, তাঁরা স্বাধীনতার পর বাংলার এই মাহাত্ম্যটা বুঝে উঠতে পারেননি। বাংলাকে মজবুত করলে যে আসলে হিন্দুস্তান মজবুত হবে আর বাংলা দুর্বল হলে যে ভারত দুর্বল হবে, এটা বুঝতেই স্বাধীনতার পরে ষাট বছর কেটে গিয়েছে। ১৮৩৫ সালের বৃটিশ গেজেট থেকে জানা যায়, সে সময় কলকাতায় শতকরা একশো

মমতা ব্যানার্জী

নরেন্দ্র মোদী

ভাগ লোক সাক্ষর ছিলেন। গোটা ভারতকে সেদিন বাংলা শক্তি জুগিয়েছে। গোটা দেশের মধ্যে সব থেকে বেশি স্কুল ছিল বাংলাতেই। সেটা কী করে সম্ভব হয়েছিল? সম্ভব হয়েছিল, কারণ পশ্চিমবঙ্গে একটা শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজ ছিল। সেই কারণে বাংলাতেই ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ হয়েছিল। আর ছিল নারীশক্তি। আমরা গুজরাতিরা সকলকেই ‘বহেন’ বলে ডাকি। আমাদের রাজ্যে স্বামীও স্ত্রীকে সম্মান দিয়ে ‘বহেন’ বলে। কিন্তু বাংলায় মেয়েরা হল মা। সেখানে মা সম্বোধনটি খুব জনপ্রিয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও সেই মাতৃশক্তির জাগরণ হয়েছে।

নতুন মুখ্যমন্ত্রী কী করবেন, কী ভাবে এগোবেন, সেটা বলতে গিয়ে প্রথমে বলব, এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলার আজ কেন এই দশা হলো, তার ইতিহাসটা বোঝা সব চেয়ে প্রথম কাজ। গুজরাতে ব্যবসার সাফল্যের পিছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। কিন্তু আসল কারণটা কী জানেন? তা হলো—ব্যবসায় একটি অভিনব পারিবারিক চরিত্র রয়েছে আমাদের রাজ্যে। বিনিয়োগকারী, পুঁজিপতি, ম্যানেজার এবং শ্রমিক—সকলে যেন একই পরিবারের সদস্য। গুজরাতে তাই একটিও কর্মদিবস নষ্ট হয় না। শ্রেণিসংঘাত নয়, বরং মালিক-শ্রমিক সখ্য দেখার মতো। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরা বলেছে, ‘ঝান্ডা উঁচা রহে হামারা, আদমি গিরে তো কোই বাত নেহি’। ৩৪ বছর ধরে ওদের প্রধান কাজ ছিল সব কিছুকে বন্ধ করা। একের পর এক তালা বন্ধ করতে গিয়ে কবে যে ৩৪টি বছর কেটে গিয়েছে, তা ওরা খেয়াল করেনি।

গুজরাতও এক দিনে আজকের গুজরাত হয়নি। যেটুকু হয়েছে, তা আমার একার কৃতিত্ব নয়। কৃতিত্ব গুজরাতের মানুষের। গুজরাতে উপকূলবর্তী সীমানা প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার। এই রাজ্যে একদা একটা বন্দর ছিল। আজ বন্দরের সংখ্যা ৪২। গোটা দেশের সমগ্র ‘কার্গো’-র শতকরা আশি ভাগ গুজরাত থেকে যায়। বাঙালিকেও নিজের রাজ্যের উন্নয়নকে প্রধান স্লোগান করে তুলতে হবে। আমি একাই শুধু মাছ খাব, সেভাবে ভাবলে হবে না। ভাবতে হবে, আমি পৃথিবীকে মাছ খাওয়াব। উন্নয়ন তখনই হয়, যখন মানুষ আস্থা ফিরে পায়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ওই আস্থা হারিয়েছেন। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে যে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তার আশু সমাধান প্রয়োজন। গুজরাতে সরকার জমির দালালি করে না। ব্যবসায়ীরা এসে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি জমি কেনে। কোনও বিতর্ক হলে, সাহায্য চাইলে, তখন সরকার সমাধানে তৎপর হয়। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরা শিল্প করতে গিয়ে এমন একটি ধারণা তৈরি করেছেন, যেন কৃষিকে অবলুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে। আপনারা হয়তো জানেন না, গুজরাতে কিন্তু ১৩ লক্ষ হেক্টর নতুন কৃষি জমি তৈরি করেছি। সরকার জমি ব্যাঙ্ক তৈরি করেছে অনেক দিন আগেই। আর কৃষি উৎপাদন বাড়লে কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়ে। বিনিয়োগ বাড়লে রাজ্যের জিডিপি বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

আসলে চাই উন্নয়নের স্লোগানে জন-আন্দোলন। আমার দু'টি স্লোগান, পি টু এবং জি টু। পি টু ফর প্রোপিপল এবং প্রো-অ্যাকটিভ। এবং জি টু হল গুড গভর্ন্যান্স। আশা করি, নতুন মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির চেয়ে উন্নয়নকে বেশি অগ্রাধিকার দেবেন।

ইতি বিনীত

নরেন্দ্র মোদী

(সৌজন্যে : আনন্দবাজার)

শব্দরূপ-৫৮২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়াঁ

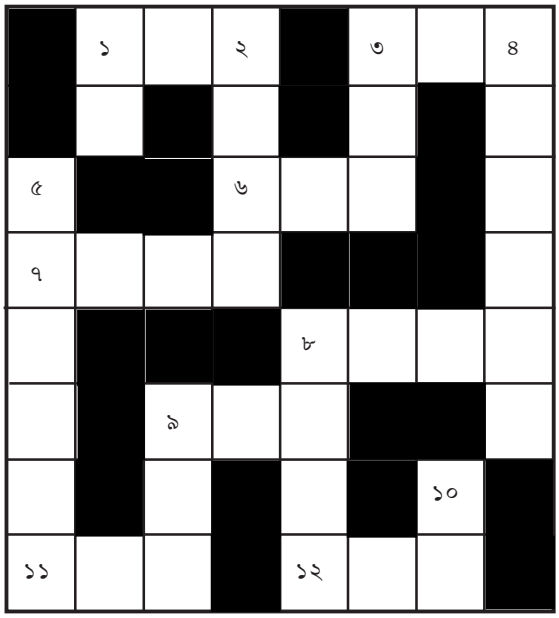

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. দিল্লীর সন্নিহিত মহারণ্য যা কৃষ্ণার্জুন কর্তৃক দগ্ধ হইয়াছিল, **৩.** রাম কর্তৃক স্বর্ণমৃগের ছদ্মবেশে নিহত রাক্ষস, **৬.** ''বদলে—লড়ে, অদনে বঞ্চিত'', দাঁত, **৭.** অগ্নি, বাজশ্রবার পুত্র, **৮.** জীমূতবাহন-কৃত পৈত্রিক ধন-বিভাগ-বিষয়ক গ্রন্থ, **৯.** কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর পুত্র, **১১.** তন্তুবায়ের তুরী, মাকু, **১২.** রাবণের মাতা।

উপর-নীচ ঃ ১. ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ, **২.** নীচতা, ''হেন সহবাসে হে পিতৃব্য, —কেন না শিখিবে?'' **৩.** ভিক্ষাকরণ, যাচন, **৪.** বর্ধমানের এই স্থানে লখিন্দরের লৌহের বাসরঘর নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ, **৫.** ''নীলদর্পণ''-খ্যাত নাট্যকার, **৮.** দিনাজপুর অঞ্চলে প্রসিদ্ধ উৎকৃষ্ট লঘু চাউল, **৯.** সরল, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য, **১০.** ভোরবেলা, অনিরুদ্ধপত্নী।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৮০
সঠিক উত্তরদাতা

শ্যামল বর্মন
সামসী, মালদা
অভীক দেব
কলকাতা-৩

■	প	র্ণা	শা	■	ভা	র	বি
■	রী	■	ন্ত	■	র্গ	■	ড়া
প	■	■	ন	কী	ব	■	ল
র	ন্তি	দে	ব	■	■	■	ত
ম	■	■	■	প	র	ন্ত	প
হ	■	ফু	ল্ল	রা	■	■	স্বী
ং	■	লি	■	ন্ত	■	ই	■
স	রু	য়া	■	ক	পী	ষ্ট	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৮২ সংখ্যার সমাধান আগামী ৬ জুন, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ৫

Swastika RNI No. 5257/57
23 May - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

গর্জে উঠুক বিপুল জনতা

কেউ কেউ বলছে যে এবার — 'এক জাতি এক প্রাণ' কেন হবে না? কেন হবে না Common Civil Code? কেন হবে না সকল ভারতবাসীর জন্য এক আইন? স্বাধীনতার ৬৪ বছর পরেও যদি না হয় তাহলে যে মহাবিপদ সামনে এগিয়ে আসছে, আমরা তার থেকে মুক্ত হব কিভাবে? এই সমস্যার কথা — এবার বিপুল জনতার সামনে, প্রচারের মাধ্যমে, বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরব, ক্রমাগত — বছরের পর বছর। জনতা বিচার করবে, কী করা যায়। কেমন করে আন্দোলন করা যায়। এভাবেই একদিন ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে উঠবে জনতার মাঝখান থেকে। অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চাই (Common Civil Code চাই), সংখ্যালঘু তকমার বিলুপ্তি চাই। সমস্ত ভারতবাসীর জন্য এক আইন চাই। এ লড়াই বিপুল জনতার। এই উদ্দেশ্য নিয়ে Forum of Nationalist Thinkers, প্রচারের কাজ শুরু করেছে। সকলের যোগদান আহ্বান করছে। সকলের সবরকম সাহায্য প্রার্থনা করছে। এ লড়াই আমাদের সকলের। হিন্দুস্থান অমর রহে। বন্দেমাতরম্।।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন
প্রধান নির্দেশিকা (ইস্যু) মাত্র দু'টি

এক - শাসকের সর্বস্তরে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি।

দুই - অভিন্ন দেওয়ানী বিধি (Common Civil Code)

-- Courtesy --

Issued in Public Interest by

FORUM OF NATIONALIST THINKERS

12, Waterloo Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 069

Mob. : 9051498919 / 9433047202

দাম : ৫.০০ টাকা